ভাড়াটে বাড়ী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চতুর্থ মুদ্রণ

—তিন টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রফুল্ল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও মানসী প্রেস, ৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

করকমলে

এই লেখকের—

মনে ছিল আশা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
রজনীগন্ধা
পুরুষ ও রমণী
দুর্ঘটনা
নববধূ
বহুবিচিত্র
নবযৌবন
কোলাহল
রাত্রির তপস্যা
প্রভাতসূর্য্য
বহ্নিবন্যা
কাছে আছে যারা
রাত-মোহানা
সীমান্ত-রেখা
কেতকী বন
জ্যোতিষী
স্বর্ণমুকুর
প্রেরণা
কমা ও সেমিকোলন
সাবালক
চতুর্দ্দোলা
কঠিন মায়া
মিলনান্ত
স্মরণীয় দিন
ছুটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
মালাচন্দন
আব্ছায়া
নারী ও নিয়তি
জন্মেছি এই দেশে
সমারোহ
কলকাতার কাছেই

আশ্রয়

ভরসা ছিল যে, স্কুলে যখন যাইতেছি, তখন আশ্রয় একটা নিশ্চয়ই পাইব, অন্ততঃ বোর্ডিং ত' আছে। এ সময়ে মফঃস্বলে অনাহূত বহু লোকই বোর্ডিং-এ আসিয়া আশ্রয় লয়, সুতরাং সেটা এমন কিছু অশোভন ব্যাপার হইবে না। সেই সাহসেই, এই অজ পাঁড়াগাঁয়ে, বৈকালের ট্রেনে মালপত্র লইয়া আসিয়া হাজির হইয়াছিলাম। কিন্তু স্টেশনে নামিয়াই যে সংবাদ পাইলাম, তাহাতে সমস্ত আশা ভরসা এক মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল। যাহাকে বলে, একেবারে বসিয়া পড়িলাম!

ছোট স্টেশন, যে সিগনালার সে-ই পোর্টার, আবার সে-ই মাস্টারের কোয়ার্টারে জল যোগায়। ট্রেন হইতে মাল নামাইবার সময় কুলীর ভরসা করি নাই, নিজেই টানিয়া নামাইয়াছিলাম কিন্তু এখন আর কুলী ছাড়া উপায় নাই, অতগুলি মাল ত' মাথায় করিয়া লইয়া যাওয়া যায় না! অসহায় ভাবে কুলী কুলী করিয়া ডাকিতে সেই অদ্বিতীয় পোর্টারটিই মাথায় গামছা জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যে ট্রেন ছাড়িয়া গেল, ইহার পরে একেবারে রাত্রি দশটা নাগাদ আর একটা কী ট্রেন আছে—সুতরাং এই দীর্ঘ সময় সবটাই ইহার অবসর। এমন সুসময়ে 'মাল' ওয়ালাবাবু নামিতে দেখিয়া সে বেশ একটু উৎফুল্ল হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে মশাই?

কহিলাম, এই এখানে, ইস্কুলে—

সে বাক্সর উপর বিছানাটা সাজাইতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হাত্তোর বরাৎ! সাত দিন পরে ভাবনু মোট একটা হ'লো,···এখানে ইস্কুল কাথাগো? সে যে আজ সাত মাস নাই মশাই!

সে কি! ইস্কুল নেই? তার মানে?

সে হাত পা নাড়িয়া কহিল, একে ত' ইস্কুলে ছেলে হ'ত না ব'লে মাস্টাররা মাইনেই পেত না, তার ওপর এ বছর জষ্টিমাসে ঝড়ে গেল চাল উড়ে। কে-বা সেরে দেয়, কে-বা কি করে! ভদ্দরলোক গেরামে কোথা—? সেই যে ইস্কুল উঠে গেল, সেই উঠেই গেল—এক্কেবারে!

চোখে যেন অন্ধকার দেখিলাম। শীতের অপরাহ্ণ; ইহারই মধ্যে, সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে, রাঢ়ের পল্লীর দিগন্তবিস্তৃত মাঠে সন্ধ্যার আব্‌ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে শুধু মাঠ, বহুদূর-দূরে এক আধখানা কুটীর চোখে পড়ে মাত্র। স্টেশন হইতে যে ধূসর পথটি গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও জনহীন—যেন নিকটে কোথাও কোন জনবসতি নাই। হঠাৎ মনে হইল, একেবারে মৃত্যুপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি!

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিলাম, তা হ'লে উপায়? এখানে ডাক-বাংলা আছে?

সে ঘাড় দাড়িয়া কহিল, না। মোল্লারপুরে আছে।

মোল্লারপুর যাবার গাড়ী আছে এখন?

সে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দিল, না। সেই ভোর পাঁচটায়।

বাঃ! হতাশভাবে স্টেশনের দিকে চাহিলাম। মাস্টার ইতিমধ্যে চাবি দিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছে, আবাব রাত্রি দশটার পূর্ব্বে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। বাসাতে গিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেও ইচ্ছা হইল না—শুধু শুধু বেচারাকে বিব্রত করা।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, কি আর হবে, তবে ঐ টিকিটঘরের সামনের বেঞ্চিতেই মালগুলো তুলে রাখো—আজ ঐখানেই রাত কাটাতে হবে।

সে যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, এই রাত্তিরে বাইরে, হিমে শুয়ে থাকবে মশাই!

তাছাড়া উপায় ?

সে একটু নিঃশব্দে ভাবিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা আপনি ম্যাস্টারের বাড়ীতে যাও না কেন। হেট্‌ ম্যাস্টারের বাড়ী—

হেড্‌ মাস্টার ? তিনি এখানেই থাকেন নাকি ?

এখানে থাকবে না ত' কোথায় যাবে, ওর ঘর যে এখানো গো !

অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী একেবারে মালপত্র লইয়া হাজির হইতে যথেষ্টই সঙ্কোচে বাধিল কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত শীতে সারারাত মাঠে বসিয়া থাকিবার কথাটা চিন্তা করিয়া সে সঙ্কোচ দমন করিলাম। লোকটির মাথায় মালপত্র চাপাইয়া অগত্যা হেডমাস্টার মহাশয়ের বাড়ীর উদ্দেশেই যাত্রা করিলাম !

সেই মাঠের মধ্য দিয়া ধূলিময় পথ, গো-গাড়ীর চক্রে পিষ্ট মিহি মাটির মধ্যে পা বসিয়া যায়, জুতাপরা এখানে শুধু বাহুল্য নয়—বিড়ম্বনা। কোনমতে তাহারই উপর দিয়া মিনিট কতক চলিয়া এক সময়ে ভগ্নপ্রায় একটা মাটির বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইলাম। সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপের মত ঘর, তাহাতে আগড় টানিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছিল, বাকী সমস্ত বাড়ীটাই নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার।

সে দিকে চাহিয়া সহসা যেন বুকের মধ্যেটা কেমন হিম হইয়া আসিল, অপরিসীম দারিদ্র্য ও আশাহীনতার চিহ্ন যেন সর্ব্বত্র সেই অন্ধকারেই নজরে পড়ে। এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করিব কি ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় সঙ্গের লোকটিই কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব চড়াইয়া ডাকিল, ও ম্যাস্টার-মশাই ! একবার বাইরে এস গো ! একটা ভদ্দর লোক এয়েছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগড় খুলিয়া গেল। একটি মধ্যবয়সী শীর্ণ ভদ্রলোক একখানা খাটো কাপড় পরিয়া আলো হাতে বাহির হইয়া আসিলেন।

আমার কাছে ভদ্রলোক এসেছেন ?

তাহার পর কাছে আসিয়া ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়াই বোধকরি বুঝিতে পারিলেন, ও, বইয়ের ব্যাপারে এসেছিলেন বুঝি ?···আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। ও বাবা কেষ্ট, মালগুলো একেবারে বাড়ীর ভেতর দিয়ে আয় বাবা—আসুন, এই যে সাবধানে—

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিঃসঙ্কোচ আহ্বান। যেন কতকালের পরিচয় ! সাবধানে দাওয়ার ভাঙ্গা সিঁড়িতে পথ দেখাইয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই চমকিয়া গেলাম। প্রায় সাত-আটটি ছাত্র বই খাতা লইয়া ঘরের মেঝেতে মাদুরে বসিয়া আছে, একমাত্র আলো মাস্টার মহাশয় বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আমিও তাহাদের অস্তিত্ব কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই—কিন্তু চমকিয়া উঠিলাম সে জন্য নয়। যে ছেলেগুলি বসিয়া আছে, তাহাদের গায়ে গরম কাপড়ের লেশমাত্র নাই, একটি ছেলের গায়ে ত' শুধু গেঞ্জি। যে উহার মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন, তাহার গায়ে একটা মোটা খদ্দরের চাদর।

আমাকে দেখিয়াই ছেলেগুলি সসম্ভ্রমে মাদুর ছাড়িয়া মাটিতে সরিয়া বসিল। মাস্টার মহাশয় আলোটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, ওরে তোরা আজ যা বাবা, এই বাবুটি এসেছেন কল্‌কাতা থেকে—ওঁর সঙ্গে একটু কল্‌কাতার গল্প করব—

তাহার পর যেন আপন মনেই কহিলেন, কতকাল কল্‌কাতা দেখিনি যে ! সেই বি-এ পাশ ক'রে কল্‌কাতা ছেড়েছি, আর যাইনি। তবু বছর বছর আপনারা পাঁচজন আসতেন, তাও বন্ধ হয়ে গেল। ইস্কুলই নেই, কী জন্যে আসবেন বলুন না ! তবু ভাগ্যি যে, আপনি খোঁজ ক'রে এলেন।

ছেলেরা সবাই নিঃশব্দে বই-খাতা গুছাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল, কেবল একটি ছেলে ভিতরে চলিয়া গেল, অনুমান করিলাম, সে উঁহারই পুত্র হইবে।

শেষ ছাত্রটি চলিয়া যাইতে কহিলেন, এবার এদের ফার্স্ট ক্লাস হয়েছিল

কিনা, শুধু শুধু ক-টা মাসের জন্যে সারা জীবনটা মাটি হয়ে যাবে ব'লে আমিই ওদের নিয়ে বসি একটু—পারে ত' প্রাইভেটে দেবে'খন—

তাহার পর সহসা নজর পড়িল আমার দিকে, ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, আরে, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন, বসুন। তামাক চলে নাকি? চলে না? আচ্ছা তাহ'লে আমিই একটু সেজে নি, কিছু মনে করবেন না।

ঘরের কোণে ভাঙ্গা বিস্কুটের বাক্সে তামাকের সরঞ্জাম, সেইখানে বসিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে কহিলেন, দুপুরের দিকে সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলে-গুলোও আসে—তা সবদিন সময় পাইনে। এই সময় আবার ধান কাটার সময়, বোঝেন ত'! যা হোক্—মাস ছয়েকের ধানটা ঘরে আসে, এই সময়ে না দাঁড়াতে পারলে সব বরবাদ হয়ে যাবে—

তামাক সাজিয়া লইয়া কাছে আসিয়া বসিলেন, তাহার পরই কী মনে করিয়া অন্তঃপুরের উদ্দেশে হাঁক দিলেন, ও বাবা পদন—

সেই ছেলেটি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। মাস্টার মহাশয় কাছে গিয়া গলা খাটো করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, পদন, তোমার দিদিকে গিয়ে বলো দেখি, বাবুটি এসেছেন, একটু চায়ের যোগাড় যদি হয়!

আমি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন মাস্টার মশাই, চা আমি খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া আমি বেশী চা খাইও না। আমাকে বড্ড লজ্জিত করছেন—

মাস্টার মহাশয় কহিলেন, মাস্টার আর নয় ভাই, ললিত। বরং বয়সে বড় আমি—ললিতবাবুই বলতে পারেন—

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। আমি পুনশ্চ ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, কিন্তু চা-টা বারণ ক'রে দিন—ও আর দরকার নেই।

তিনি আমার হাতের কব্জির কাছে খানিকটা চাপ দিয়া কহিহেন, কেন ভাই কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আমাদের গরীবের ঘর, যদি আপনার দৌলতে একটু

চায়ের জোগাড় হয়ই ত' আমিও কোন্ না একটু পাবো। বুঝলেন না? চেপে যান, চোপ যান—

অপ্রস্তুত হইয়া অন্য কথা পাড়িলাম। কহিলাম, ইস্কুলটা উঠে গেল কেন, ললিতবাবু?

আর ভাই ইস্কুল! ছেলে ত' ছিল মোটে একশ' সাতটি। মাইনে কিছুই উঠত না, আগে জমিদারদের কিছু 'এড্' পাওয়া যেত, তাও বছর-তিনেক বন্ধ। আমার ষাট টাকা মাইনে, পঁয়তাল্লিশ টাকা পাবার কথা, কিন্তু ইদানিং কুড়ি টাকাও কোন মাসে ঘরে আনতে পারতুম না। কি করি বলুন, সবাইকে দিয়ে থুয়ে ত' নিতে হবে! কোন কোন মাস্টার মশাই পাঁচ ছ' টাকার বেশী নিতেই পারতেন না।

আলোটার দিকে চাহিয়া কী যেন ভাবিতে ভাবিতে চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ঐ অবস্থা, কাজেই বাড়ীটা সারাতে পারিনি বহুদিন। বোর্ডিং-এর চালটা অনেকদিন গিয়েছিল, ইস্কুল বাড়ীতেই কোন রকমে কাজ চালাচ্ছিলুম, তারপর চালটা গেল ঝড়ে উড়ে। একটা দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল—এ অবস্থায় আর কোথায় ইস্কুল করি বলুন!

সসঙ্কোচে কহিলাম, তা এখানে কোন রকম চাঁদা টাঁদা তুলে—

চাঁদা!—ললিতবাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, কে দেবে বলুন ত' চাঁদা। ছেলেদের ত' দেখলেন, পেটে ভাত নেই, গায়ে কাপড় নেই। এদের বাপ-মা চাঁদা দেবে? গত বৎসর ধান হয়নি একদম, সারা গাঁ, বলতে গেলে, উপোস ক'রে আছে—এখন ইস্কুলের মাইনেই চাওয়া যেত না, তা চাঁদা! উপায় নেই ভাই, জমিদারের অবস্থাও সসেমিরে, নইলে না হয় দেখা যেতো! অবিশ্যি চেষ্টা আমি ছাড়িনি এখনও, কিন্তু—

এমন সময়ে চা আসিল। দুধ নাই, শুধু চা আর চিনি। সঙ্গে রেকাবিতে পুরাতন, বিবর্ণ দুটি রসগোল্লা। অতিথি সৎকারের আনন্দে

ভদ্রলোক দিশাহারা হইয়া কহিলেন, বা-রে! এরি মধ্যে বুঝি রসগোল্লাও এনে ফেলেছিস? বেশ, বেশ, তা ভদ্রলোককে মুখ-হাত ধোবার জল যে একটু দিতে হবে বাবা—

পদন ছুটিয়া গেল। আমি কহিলাম, এইটি বুঝি ছেলে আপনার?

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ললিতবাবু কহিলেন, না, ঠিক ছেলে নয়, তবে ছেলের মতই। ওটিও ছাত্র। বছর-দুই আগে ওর বাপ মরে যায়, আর কেউ নেই, আমার কাছেই রেখেছি। মাথাটি ভাল, আর বেশ ঠাণ্ডা। বড় সৎ ছেলে—

পদন জল লইয়া আসিল। বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্ফল জানিয়া উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিলাম, তাহার পর রসগোল্লা দুটির দিকে দেখাইয়া সবিনয়ে কহিলাম, আবার কেন পীড়ন করছেন বলুন ত'—

ললিতবাবু ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিলেন, কিছুই করতে পারিনে ভাই, বড় গরীব। এ কি আর সবদিন জোটে? আজ যদি মা কমল জোগাড় করতে পেরেছে ত' আপনার সেবাতেই লাগুক্—ও আর দ্বিধা করবেন না।

অগত্যা আমার সেবাতে লাগাইতে হইল। প্রয়োজন ছিল না, তবুও। পাছে ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হন।

প্রশ্ন করিলাম, ছেলেরা কিছু কিছু দেয় ত'?

দেবে? আপনি কি ক্ষেপেছেন! দুবেলা পেটপুরে খেতেই পায় না। বই—তা-ও অর্দ্ধেক ছেলের নেই। পালা ক'রে ক'রে পড়ে—

কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আপনারই বা এমন ভূতের ব্যাগার দিয়ে চলে কি ক'রে? ধানও ত' শুনলুম পুরো বছরের পান না!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, উনি চালান! চলে যে কি ক'রে তা ভেবে দেখিনি। মেয়ে আমাকে কিছুই বলে না, যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন ঘটি-বাটি বেচে চালায়। তাও আর বিশেষ রইল না!

তাহার পর সহসা যেন সব দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিলেন, মরুক গে,

আমার দুঃখের কান্না আর শুনে কাজ নেই। ততক্ষণ দুটো কল্‌কাতার গল্প করুন—

নানাকথার মধ্য দিয়া গল্প জমিয়া উঠিল। ললিতবাবু যখন মেসে ছিলেন তখনকার কলিকাতার বিবরণ শোনাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যেই কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার কথাও শুনিলেন। তারপর সহসা লেখাপড়ার কথা উঠিতে প্রথম যেন মানুষটিকে চিনিতে পারিলাম। দেখিলাম, ভদ্রলোক সাধারণ ইস্কুল মাস্টার নহেন, পড়াশুনা বিস্তর করিয়াছেন। শিক্ষা সত্য-সত্যই একসময়ে ইঁহার সাধনা ছিল।

ভাঙ্গা লণ্ঠনটা তুলিয়া দেওয়ালের পাশে একটা ভাঙ্গা শেল্‌ফের সামনে ধরিলেন। এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম, সেখানে বিস্তর বই সাজানো রহিয়াছে। ধূলায় বিবর্ণ, কিন্তু তবু ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের কতকগুলি মূল্যবান বই চিনিতে বিলম্ব হইল না। বই-এর ব্যবসা করি সুতরাং তাহাদের আর্থিক মূল্যও যে কম নয়, তাহাও বুঝিলাম।

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি এত লেখাপড়া শিখে এভাবে পড়ে আছেন কেন? যে-কোন জায়গায় আপনি অনায়াসে ভাল মাস্টারী পেতে পারতেন!

ঈষৎ যেন অপ্রতিভভাবে হাসিয়া ললিতবাবু কহিলেন, তা বটে। সে কথা আমি নিজেও ভেবে দেখেছি অনেকবার। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, গ্রাম থেকে যদি সবাই চলে যায়, তা' হ'লে গ্রামের কি দশা হবে ভেবে দেখুন ত'! এখনই ত' এই অবস্থা। গ্রামে এমন একটা শিক্ষিত লোক নেই যে, একখানা দরখাস্ত লেখে। চাকরী আমি ভালো পেয়েছিলুম ঢের কিন্তু গ্রামের ইস্কুলের মায়া কাটাতে পারিনি। আমারই চেষ্টাতে হাইস্কুল হয়েছিল—আবার আমারই চোখের সামনে চলে গেল। এখন আর বাইরে যেতে পারব না, বুঝলেন, too old for that।

চুপ করিয়া রহিলাম। ললিতবাবুও একটু নিস্তব্ধ হইয়া থাকিয়া আবার

কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর হইতে পদন আসিয়া ললিত-বাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি মাতুরের উপর মুড়ি দিয়া বসিয়া ললিতবাবুরই একখানা বই-এর পাতা উল্‌টাইতে লাগিলাম। একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন, এবার যে অনুগ্রহ ক'রে উঠতে হয়! কিছুই নেই, বলতে গেলে শুধু ভাত, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর মুখে দিতে পারবেন না।

আহারের প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না কিন্তু তবু উঠিতে হইল। কারণ ইতিমধ্যেই মানুষটিকে চিনিয়াছি, 'খাইব না' বলিলে উঁহাকে আঘাত দেওয়া হইবে।

ভিতরের দাওয়ায় জায়গা হইয়াছে। ভাত, ডাল ও একটা কুমড়ার তরকারী। দ্বিতীয় অবলম্বন নাই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু ললিতবাবুর মুখের প্রসন্নতায় বুঝিলাম, ইহাও সম্ভব হইবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল।

ছু-টি যোটে আসন, আমি আর পদন বসিলাম। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বসলেন না?

ললিতবাবু অম্লানমুখে কহিলেন, আজ যে ভাই একাদশী, বিকেলে ত' আমি কিছুই খাই না—

প্রথমটা অত মনে ছিল না। কিন্তু তুই-চারি গ্রাস ভাত খাইবার পরই সহসা মনে পড়িল যে, বোলপুরে যাঁহাদের বাড়ী ছিলাম, সেখানকার বিধবা গৃহিণী পরশু দিন একাদশীর উপবাস করিয়া কাল জল খাইয়াছেন। গোস্বামীমতেও আর সময় নাই। ব্যস্ত হইয়া মুখ তুলিতেই সহসা চোখ পড়িল ললিতবাবুর কন্যার দিকে, রান্নাঘরের দরজার সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। চোখে তাহার করুণ মিনতি, আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা সে অনুমান করিয়া যেন আমাকে চুপ করিয়া থাকিবারই অনুরোধ জানাইতেছে। অগত্যা চুপ করিয়া গেলাম কিন্তু গলার কাছে ভাত যেন ডেলা পাকাইতে লাগিল।

ললিতবাবু সামনে বসিয়া তদারক করিতেছিলেন, কহিলেন, এ আপনাদের গলায় নামবার নয়, কিন্তু কোনমতে গর্ত্তটা বুজিয়ে ফেলুন। না, না অমন ক'রে ঠেলে রাখবেন না, তা হ'লে আমার বড্ড কষ্ট হবে—

তাহার পর হাঁক পাড়িলেন, মা কমল, একটু অম্বল দেবে না এঁদের ?

কমলা দুটি ছোট পাথরের বাটীতে করিয়া আম্সীর অম্বল লইয়া বাহির হইয়া আসিল। এইবার ভাল করিয়া দেখিলাম মেয়েটিকে। বয়স কুড়ির বেশীই হইবে, দেখিতে কেমন তাহা বলা কঠিন—অর্থাৎ ভাল বা মন্দ কিছুই স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে না—নিতান্তই সাধারণ। দেহ একেবারে নিরাভরণ, বৈধব্যের বেশ।

অম্বল রাখিয়া প্রস্থান করিলে ললিতবাবু কহিলেন, মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। আমার আর কি—ক-টা দিনই বা আছে! মেয়েটা যে কোথায় দাঁড়াবে, তাই ভাবি—

চুপি চুপি প্রশ্ন করিলাম ওঁর শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

শ্বশুরবাড়ী! ওর ত' বিয়ে হয়নি ভাই—।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, হাসিয়া কহিলেন, ও, ওর ঐ বেশভূষার কথা বল্ছেন? মেয়েটা পাগল ভাই, ওর কথা বলেন কেন? বলে, এ-ই বেশ, মিছিমিছি জবাবদিহি করতে হবে না যে, এত বয়স অবধি বিয়ে হয়নি কেন!...

কতখানি ব্যথায় ইহা সম্ভব হইয়াছে, ভাবিয়া কথাটা তুলিবার লজ্জাতেই মরিয়া গেলাম। কোনমতে আরও দুটি ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এবার আর ললিতবাবু বাহিরের ঘরে যাইতে দিলেন না, ভিতরের দু'খানি ঘরেরই একখানিতে পথ দেখাইয়া আসিলেন। একটা চৌকিতে কে আমারই বিছানাটা খুলিয়া পরিপাটী করিয়া পাতিয়া রাখিয়াছে, পাশে একটা জলচৌকীতে স্যুটকেস দুটি পর পর সাজানো।

তাহার উপর এক গ্লাস জল ঢাকা, রেকাবীর উপর দুইখিলি পান। এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। বেশ একটা পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন সর্ব্বত্র।

• ললিতবাবুও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া চৌকিতে বসিলেন। যেন পূর্ব্ব কথারই জের টানিয়া বলিয়া চলিলেন, এই গ্রামেরই একটি ছেলে বিনয় ব'লে, কমলার সঙ্গে ছেলেবেলায় বড় ভাব ছিল; ওঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, বিনয়ের সঙ্গে কমলার বিয়ে হয়। সেই জন্যে আমি যত্ন ক'রে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, এইখান থেকেই পাস ক'রে কল্‌কাতায় আই-এস-সি পড়তে যায়, তারপর ঢোকে মেডিকেল কলেজে। কমলার মায়ের যা দু'একখানা গহনা ছিল, তাই বেচে ওর খরচা চালিয়েছি। ভাব্‌লুম যে আর ত' পাঁচটা নেই—ওই একটা মেয়ে, সুখী হোক্। কিন্তু ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়তে পড়তে হঠাৎ তিনদিনের টাইফয়েডে বিনয় মারা গেল। আমাকেও ধনে প্রাণে মেরে গেল!

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনশ্চ বলিলেন, সবই আমার বরাৎ! সে বেঁচে থাকলে আজ আমার ভাবনা কি ছিল! অমন ছেলে জামাই হবে, এরও ত' বরাত থাকা চাই।···কতকটা সেই থেকেই মা আমার হাতের রুলি দু'গাছা খুলে ফেলেছে। অবশ্য আর বিশেষ কিছু ছিলও না—

মুখে কোন সান্ত্বনার ভাষা আসিল না, অনেকক্ষণ পরে বলিলাম, কিন্তু বিয়ে ত' আপনাকে দিতেই হবে—

কি জানি সে আর সম্ভব হবে কিনা। আমি ত' কিছুই বুঝতে পারি না—

কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে ললিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ যেন দিশাহারা হইয়া গেছেন, এম্‌নি তাঁহার দৃষ্টি! কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোথায় যাবো, কি চেষ্টা করব, কিছুই বুঝতে পারি না। মেয়েটা সবদিন পেট ভরে খেতেও পায় না, সবই বুঝি—কিন্তু—

তাহার পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, বড্ড রাত হয়ে গেল, ঘুমোও ভাই তুমি—

উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া কহিলাম, কাল ভোরে ত' আমার গাড়ী, লোকটাকেও আসতে বলেছি। তখন কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?

নিশ্চয় হবে, সে কি কথা। আমি খুব ভোরেই উঠি। ঘুমই হয় না ভাল ক'রে—আচ্ছা ভাই ঘুমোও—

তিনি চলিয়া গেলেন। অতিথি সৎকার শেষ করিয়া তিনি অনায়াসে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িলেন কিন্তু অতিথির চোখে নিদ্রা আসিল না। পদনও বোধকরি শুইয়া পড়িয়াছে, খালি জাগিয়াছিল একা কমলা। সে রান্নাঘরে কি কাজ সারিতেছিল। হয়ত তাহারও খাওয়া হইল না।

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা কাহার মৃদু পদশব্দে চমক ভাঙ্গিল। বাহির হইতে কমলা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, জল-টল কিছু চাই আপনার ?

জল ? না, কিচ্ছু না।

তাহার পর, সে চলিয়া যায় দেখিয়া, সব দ্বিধা জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ডাকিলাম, একবার শুনুন।

কমলা নিঃসঙ্কোচে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, আচ্ছা, আপনার বাবা এখনও এমন ক'রে সবাইকে আশ্রয় দেন, আপনি বাধা দিতে পারেন না ? পরকে খাইয়ে নিজে উপবাসী থাকারও ত' একটা সীমা আছে !

কমলা নতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, এই গ্রামের মধ্যে চিরকাল সকলে ওঁরই আশ্রয় নিয়েছে। এখন কি আর বাধা দেওয়া সম্ভব ? অমনিই ত' উনি এখন আর কাউকে ভাল ক'রে আদর-অভ্যর্থনা করতে পারেন না, ছাত্রদের বই-খাতা জোগাতে পারেন না ব'লে মরমে মরে আছেন—তার

উপর আর কত আঘাত দেব বলুন। আজ যদি আপনি এখানে আশ্রয় না পেয়ে যেতেন, তাহ'লে যে ব্যথা ওঁর লাগত, তা ওঁর নিজের না-খাওয়া থেকে ঢের বেশী।

তা বটে! আর কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইলাম না। কমলা একটু অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। আমি তখন কতকটা মরিয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিলাম, একটা কথা বল্‌ছিলুম—

কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবার তাহার স্থিরদৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আপনি কি আমাদের কিছু সাহায্য করতে চান?

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। তবু চুপ করিয়া থাকা চলে না, বলিলাম দেখুন এটাকে ওভাবে দেখবেন না। আপনার বাবা দেবতুল্য লোক, তাঁকে প্রণামী দিচ্ছি, তাই ভাবুন। নয়ত তাঁর ছাত্রদের জন্যেই যৎকিঞ্চিৎ—

সহসা ডান হাতখানা মেলিয়া কমলা বলিল, আমি এমনিই নিচ্ছি। দিন্—

ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ সুযোগ আর আমি ছাড়িলাম না। গাড়ীভাড়ার টাকা রাখিয়া যাহা কিছু ছিল সবই তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

টাকাটা হাতে পড়িতেও কিন্তু সে হাত সরাইয়া লইল না। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি কেমন একরকম অদ্ভুতভাবে দূরের জানালায় নিবদ্ধ, দুটি চোখ প্লাবিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে ধারায় ধারায়।

সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, এ যে ওঁর কত বড় অপমান, তা আপনি কোনদিন বুঝবেন না, তবু আমি আজ 'না' বলতে পারলুম না।···আজ সাত-আট দিন ধরে রাত্রিবেলা ওঁর খাওয়া হচ্ছে না। অথচ ক্ষিদে উনি একেবারে সইতে পারেন না—

উচ্ছ্বসিত রোদনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কমলা দ্রুত প্রস্থান করিল।

বাহিরের অন্ধ প্রকৃতি এবং ঘরের কোণে স্তব্ধ প্রদীপ শুধু এই মর্ম্মন্তুদ অভিনয়ের সাক্ষী রহিল।

গাড়ীর আড্ডা

সর্ব্বেশ্বরের পরোটার দোকানখানা ভোর ছ'টা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সরগরম থাকিত। তাহার কারণ অবশ্য স্টেশনের পাশে এই গাড়ীর আড্ডাটাই। দোকানের সামনে আল্‌কাতরা মাখানো পায়াভাঙ্গা তক্তপোষটা কে বা কাহারা কবে পাতিয়াছিল আজ আর সে কথা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু ঐ একটি মাত্র চৌকীতেই গাড়োয়ান এবং গাড়ীর মালিকদের দিনরাত আড্ডা চলিত। ইহারই উপর বসিয়া তাহারা সর্ব্বেশ্বরের স্বহস্তে-প্রস্তুত আলুর-দম দিয়া পরোটা খাইত, চা খাইত, তাস খেলিত, পৃথিবীর হাল চাল লইয়া আলোচনা করিত এবং পরস্পরের সহিত কুৎসিত ভাষায় বিবাদ করিত।

এই আড্ডাটাকে এখান হইতে সরাইবার জন্য গ্রামের বহু ভদ্রলোকই বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। গাড়ীগুলি স্টেশনের কাছেই থাকা দরকার সুতরাং ইহাদের সরিয়া যাইতে বলা যায় না; সরানো যেটা চলিত সেটা সর্ব্বেশ্বরের দোকান, কিন্তু তাহাও সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ অবশ্য অযোধ্যা পাঁড়ের সহিত সর্ব্বেশ্বরের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অযোধ্যা পাঁড়ে এ অঞ্চলের সকলেরই পরিচিত, তিনখানি গাড়ীর মালিক সে, তাহার মধ্যে একখানা সে নিজেই চালায়। তাহার বাবা শম্ভু পাঁড়েও গাড়ী চালাইয়া প্রচুর পয়সা করিয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও অযোধ্যা পৈত্রিক ব্যবসা ছাড়ে নাই, তিনখানি গাড়ীই নিজের তত্ত্বাবধানে ভাড়া খাটাইত এবং দিনরাত প্রায় আড্ডায় পড়িয়া থাকিত। তবে তাহার প্রতিপত্তির ইহাই একমাত্র কারণ নয়, সে কিছু কিছু তেজারতি কারবারও করিত; গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলকেই সময়-অসময়ে অযোধ্যার কাছে হাত পাতিতে হইত বলিয়া সকলেই তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত।

তাহা ছাড়া অযোধ্যার তেজারতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শুধুহাতেই টাকা ধার দিত। নিজের প্রশস্ত বুকটায় আঘাত করিয়া কহিত আমার টাকা ফাঁকি দেবে, এমন বাপের বেটা ত' আমি আজও দেখিনি। তবে হ্যাঁ, যদি মরে যায় ত' ও দোস্‌রা কথা, মরার বাড়া গাল নেই। কিন্তু বেঁচে থাকলে আমি আদায় ক'রে নেবই! হাঁ-হাঁ বাবা, আমার কাছে আইনও নেই, আদালতও নেই—টাকা ধার দিয়েছি, সময় হ'লে গায়ের জোরেই আদায় ক'রে নেব্‌।

আর বাস্তবিকই তাহার সেই ছব ফুট দেহ এবং বিয়াল্লিশ ইঞ্চির ছাতি-খানার দিকে চাহিলে তাহাকে ফাঁকি দিবার কল্পনা পর্য্যন্ত কাহারও মাথায় আসিত না।···

কিন্তু এ-হেন অযোধ্যার সহিতই সর্ব্বেশ্বরের সেদিন সাংঘাতিক বিবাদ হইয়া গেল। আর সে বিবাদের কারণও যেমন হাস্যকর, তেমনি তুচ্ছ!

কারণটা শুরু হইয়াছিল অবশ্য সর্ব্বেশ্বরের মেয়ে পুঁটিকে উপলক্ষ্য করিয়াই—

সর্ব্বেশ্বর যখন প্রথম তারকেশ্বর হইতে এখানে আসিয়া পরোটার দোকান দেয়, তখন পুঁটির বয়স ছিল মাত্র সাত বৎসর। তখন সর্ব্বেশ্বরই মেয়েকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইত, এবং দুজনে রাত্রে দোকানঘরেই শুইয়া থাকিত। কিন্তু গত চার পাঁচ বৎসর যাবৎ, মেয়ে একটু বড় হওয়ার পর, সর্ব্বেশ্বরের দোকানের পিছনে নরহরির গোয়ালের পাশের চালা ঘরটা ভাড়া করিয়া সেইখানেই বাসা করিয়া আছে। পুঁটিই সেখানে রান্নাবাড়া করে এবং দুপুর বেলা দোকানে সর্ব্বেশ্বরকে ভাত দিয়া যায়। ইহা ছাড়াও তাহাকে প্রায় পান-জল দিবার জন্য দোকানে আসিতে হয়, সর্ব্বেশ্বরের কিছু প্রয়েজেন হইলে সে দোকানে বসিয়াই মেয়েকে হাঁক দেয়।

অবশ্য তাহার জন্য কোন দিনই কোন গোলমাল বাধে নাই। একে ত' পুঁটি মেয়েটি একটু গম্ভীর, তাহার উপর সে সর্ব্বেশ্বরের মেয়ে বলিয়া

গাড়োয়ানেরা পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনদিন কোন আলোচনা করিতে সাহস করে নাই।

কিন্তু সেদিন সর্ব্বেশ্বরই কথাটা হঠাৎ পাড়িয়া ফেলিল, বংশীকে হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া দিতে দিতে কহিল, মেয়েটার জন্য একটা পাত্তর-টাত্তর খোঁজ্ বংশী, আর কতদিন ঘরে রাখব—

বংশী হাতটা হুঁকার মত করিয়া পাকাইতে পাকাইতেই জবাব দিল, ক'বছরের হ'ল সর্ব্বেশ্বরদা—?

মনে মনে হিসাব করিয়া সর্ব্বেশ্বর কহিল, তা হ'লো বৈকি, এখানে যখন প্রথম আসি, তখন ওর বয়স ছিল সাত, আর সে-ও ত' প্রায় বছর-আষ্টেকের কথা হ'ল !···তা পনেরোর কম হবে না—

বংশী কহিল, তাহ'লে ত' পাত্তর খুঁজতেই হয়। তোমাদের বামুনের ঘর ব'লেই তাই, আমাদের ঘর হ'লে এ্যাদ্দিন গায়ে থুতু দিত।

ক্যাব্লা কহিল, কিন্তু পুঁটির বিয়ে দিলে তোমার কি অবস্থা হবে ঠাকুর মশাই ? আবার বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে খেতে হবে ত' ?

সর্ব্বেশ্বর কহিল, সে ভয়টা মনে মনে ছিল ব'লেই ত' এতদিন গড়িমসি করেছি, কিন্তু আর যে রাখা যায় না—

কিছুক্ষণ তামাক টানিবার পর বংশী কহিল, তা আমি বলি কি এক কাজ কর সর্ব্বেশ্বরদা, ঐ নীলকমলের মুদীর দোকানে যে ছোক্‌রা কাজ করছে, সুরেন, ও ত' শুনেছি বামুন, ওর সঙ্গেই পুঁটির বিয়ে দিয়ে দাও; দিয়ে ওকে এখানে এনে রাখো—তোমার দোকানও দেখ্‌বে'খন, তারপর তুমি বুড়ো হ'লে এই দোকানেই পাকা হয়ে বসবে।

সর্ব্বেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, না ভাই, বামুনের ঘরে গরু আর জোটাব না। একে নিজে এই কাজ ক'রে গেলাম সারা জীবন, আবার জামাইকেও এই কাজ করতে হবে, ওর মধ্যে আমি নেই। তার চেয়ে মেয়ে আমার আইবুড়ো হয়ে থাক সে-ও ভাল—

অযোধ্যা এতক্ষণ তক্তপোষেরই এক দিকে চিৎ হইয়া শুইয়া একখানা বাংলা ছড়ার বই মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল, সহসা উঠিয়া বসিয়া কহিল, অত ভাবছিস্ কেন সর্ব্বেশ্বর, পুঁটিকে আমার হাতেই দিয়ে দে—সব গোল চুকে যাক্।

কথাটা হয়ত ঠাট্টাই, আর তাই মনে করিয়াই সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু অযোধ্যার সেদিন সিদ্ধির পরিমাণটা কিছু বেশী হইয়াছিল, সে অকস্মাৎ ধমক্ দিয়া উঠিল, তোরা সব দাঁত বার ক'রে হাসছিস্ যে? কথাটা কী এমন হাসির হ'ল শুনি? না হয় আমার চল্লিশ বছর বয়সই হয়েছে, কিন্তু আমি তোদের সবাইকার থেকে জোয়ান আছি —তা জেনে রাখিস—

তাহার পর সর্ব্বেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ছেথ সর্ব্বেশ্বর, ভাল ক'রে ভেবে ছাখ, আর এমন বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াতে আমারও ইচ্ছে করে না, অনেকদিন ধরেই ভাবছি ঘর-সংসার করি—

সর্ব্বেশ্বর হাসিয়া কহিল, সিদ্ধির ঝোঁকে রোজই ত' একবার ক'রে বলিস্ ঘরসংসার করব কিন্তু নেশা কেটে গেলে আবার সব ঠাণ্ডা—

তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া অযোধ্যা কহিল, মাইরি না, এই তোকে ছুঁয়ে বল্‌ছি। এবারে পাকা কথা। বল্, তাহ'লে এখনি ভট্‌চার্যিবাড়ী গিয়ে দিন ঠিক ক'রে ফেলি—

সর্ব্বেশ্বর কহিল, তুই কি ক্ষেপেছিস্ অযোধ্যা, তোরা হলি খোট্টা বামুন, তোদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয়ে থাকে কখনও?

অযোধ্যা কহিল, খোট্টা বামুন তা তোর কি? আমি বড় বামুন তা জানিস? আমি যদি ছোট হই তাতে তোর মাথা ব্যথা কেন?

সর্ব্বেশ্বর কহিল, হয়েছে হয়েছে, এখন এক ছিলাম তামাক খা, মাথা ঠাণ্ডা কর্।

অযোধ্যা কিন্তু ঠাণ্ডা হইল না, রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, মেয়ে দিবি না তুই তাহ'লে ?

সর্ব্বেশ্বরেরও কেমন জেদ চাপিল, কহিল, না। খোট্টা বামুনকে মেয়ে দিলে আমাদের জাতে ঠেল্‌বে—

অযোধ্যা কহিল, জানিস্‌ এই খোট্টাদের দেশ থেকেই তোদের দেশে বামুন এসেছে ?

সর্ব্বেশ্বর অবিশ্বাসের সুরে কহিল, যা, যা, তোরা আবার বামুন, তার আবার কথা! তোদের কি আচার-বিচার কিছু আছে নাকি ?

ভীষণ মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অযোধ্যা কহিল, বটে, তোর হাতে পরোটা-তরকারী খাই ব'লে ? জানিস্‌ যেখানে আমরা পা ধুই, সেখানে তোর বাবার সাধ্যি নেই যে গিয়ে দাঁড়াতে পারিস্‌ ?

সর্ব্বেশ্বর দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, ছাখ্‌ অযোধ্যা, খামোকা বাপ্‌ তুলিস্‌নি ব'লে দিলুম! মেড়ো বামুন, গাড়ী চালায়, তার হাতে দেবো আমি মেয়ে, তার চেয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবো, তাও ভাল!

ইহার পর যে কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, তাহা কেহই ভাল রকম বুঝিতে পারিল না। অযোধ্যা গিয়া সর্ব্বেশ্বরের গলা টিপিয়া ধরিল এবং সর্ব্বেশ্বর দিতে লাগিল কুৎসিত ভাষায় গালি। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িয়া দু'জনকে ছাড়াইয়া দিল, কিন্তু অযোধ্যা আর বেশী আস্ফালন করিল না, শুধু ভীষণ কণ্ঠে কহিল, এর ফল পাবি সর্ব্বেশ্বর, নইলে আমি শম্ভু পাঁড়ের ছেলে নই—

তাহার পর সে সোজা নিজের বাসায় চলিয়া গেল। ক্যাব্‌লাকে বলিয়া গেল, ঘোড়াগুলো খুলে দে। আমি আর ফিরব না—

কিন্তু তখনও সকলে মনে করিয়াছিল যে, ইহা সিদ্ধির নেশা, নেশা ছুটিয়া গেলেই ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে। সর্ব্বেশ্বরেরও সেই আশা ছিল, তাই

সে অন্যদিনের মতই ভোরবেলা ময়দা মাখিয়া চায়ের জল চাপাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু বেলা বাড়িতে গাড়োয়ানরা যখন একে একে আসিয়া মিহিরের বেগুনির দোকানে গিয়া জড়ো হইল, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। ইহা যে অযোধ্যারই হুকুম তাহাতে সর্ব্বেশ্বরের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না, শুধু সে যে ঐ সামান্য কারণে তাহার এত বড় সর্ব্বনাশ করিবে সেই কথাটাই যেন তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। সে পাংশু, বিবর্ণ মুখে খাবার সাজাইয়া বসিয়া রহিল এই আশাতে যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বংশী কি ক্যাবলা কি পরাণ—জোর করিয়া অযোধ্যাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে! সে ক্ষেত্রে সে আর বৃথা মানের কান্না না কাঁদিয়া, নিজে গিয়াই কি ভাবে অযোধ্যার কাছে মাপ চাহিবে, তাহারও একটা মুসাবিদা মনে মনে ভাঁজিয়া রাখিল।

কিন্তু দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল, তখনও কাহারও দেখা নাই। খরিদ্দার, বলিতে গেলে, তাহার বারো আনাই গাড়োয়ানের দল, সুতরাং সারা সকাল ধরিয়া তাহার পুরা ছয় আনাও বিক্রী হইল না। পরোটাগুলি গামলার মধ্যে শুকাইয়া উঠিল, আলুর দম ও তরকারীতে টক্ গন্ধ ছাড়িয়া গেল, আর তাহারই সামনে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল সর্ব্বেশ্বর একা।

নীলকমল হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা, পীরিত ঘুচ্‌ল নাকি ?

সত্য তাহার সহিত ফোড়ন দিয়া কহিল, আজ মিহিরেরই পোয়া বারো আর কি !

শুধু নরহরি আসিয়া সৎপরামর্শ দিল, অযোধ্যার বাড়ী যেয়ে রাত্তির-বেলা ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও গে ঠাকুরমশাই, কেন থামাকো ব্যবসাটা নষ্ট করবে—!

সর্ব্বেশ্বরের সমস্ত ক্ষোভটা গিয়া পড়িল নরহরির উপর, ঐ ছোটলোক গাড়োয়ানটার পায়ে ধরব আমি ? কেন, কি দুঃখে ? সে বংশে আমার জন্ম নয়—এই জেনে রেখে দিস্। আমি না হয় আজ পেটের দায়ে এই

কাজ করছি, আমার ঠাকুর্দ্দা কোনদিন ভেন্নগোত্তরে এক ঘটি জল পর্য্যন্ত খায়নি।

নরহরি উদাসকণ্ঠে কহিল, তোমার ইচ্ছে, কি আর বলব বলো!

তখনকার মত সে চলিয়া গেল। কিন্তু নরহরি লোকটি সত্যই ভাল, সে সন্ধ্যার পর একবার নিভৃতে অযোধ্যা পাঁড়েকেও ধরিল, দাদা এতকালের বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে, কেন মিছিমিছি একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ওর সব্বনাশটা করবে। ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে মিটিয়েই নাও।

অযোধ্যা কহিল, তা ব'লে কি আমায় গিয়ে ওর পায়ে-হাতে ধরে মিটিয়ে নিতে হবে নাকি?—আমি ওর চেয়ে সব দিক দিয়েই বড়, ইচ্ছে হয় ও এসে মিটিয়ে নিক্—

নরহরি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, অযোধ্যা তর্জ্জনী তুলিয়া কহিল, ব্যস্…ওকথা আর না।

সুতরাং কিছুই হইল না। পরের দিন বিক্রী হইল সাড়ে চার আনা, তাহার পরের দিন আরও কম। ইহার উপর ঘরখানার মালিক যিনি, তিনি সহসা আসিয়া বলিয়া গেলেন, দুমাসের ভাড়া বাকী আছে ঠাকুর, এটা চুকিয়ে দেবে আর এবার থেকে ভাড়া আগাম দেবে, নইলে আর রাখতে পারব না।

ইহার আড়ালেও যে কে আছে তাহা সর্ব্বেশ্বর বুঝিল। গুম্ হইয়া একা দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, পুঁটি আসিয়া কহিল, বাবা, দোকানী বললে আর বাকী দেবে না—এবার থেকে নগদ কিনতে হবে।

কথাটা সর্ব্বেশ্বরের মাথায় ঠিক ঢুকিল না। কহিল, তার মানে? ওকে ত' দু-চার দিন বাদে-বাদেই সব চুকিয়ে দিই!

পুঁটি জবাব দিল, তা জানিনে।…বলছিল আবার, 'তোদের ত' দোকান উঠে যাবে এইবার, কী দিয়ে আর দাম শোধ দিবি?'

সর্ব্বেশ্বর আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন করিয়া

হঠাৎ যে সর্ব্বনাশের সামনা-সামনি আসিয়া পড়িবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। এ দোকান হইতে দুইটা প্রাণীর খরচা চালাইয়া বিশেষ কিছু জমে না, হাতে নগদ টাকা যা আছে, বড় জোর এক সপ্তাহ চালানো যায়, আর যা আছে তাহার স্ত্রীর দরুণ সামান্য দুই-একখানা সোনারূপার অলঙ্কার, তার সবগুলি বিক্রী করিলেও একশ' পুরা টাকা পাওয়া যাইবে না। পোস্ট অফিসে একটা খাতা আছে বটে, কিন্তু সেখানেও বোধ হয় তিন-চার টাকার বেশী পড়িয়া নাই।

অথচ এখানে আর এমন করিয়া দোকান চলিবে না, ইহাও ঠিক। সর্ব্বস্বান্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে এখানে আর দুই তিন মাস কাটানো যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ কি?...এক উপায় আছে অযোধ্যার পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া লওয়া, নয়ত রাতারাতি আর কোথাও চলিয়া গিয়া একেবারে নূতন করিয়া পত্তন করা। দুইটি কথাই সে ভাবিয়া দেখিল। না হয় মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া অযোধ্যা পাঁড়ের পায়েই ধরিল, কিন্তু সে যদি সত্যসত্যই পুঁটিকে চাহিয়া বসে?...বয়স চল্লিশের উপর উঠিয়াছে, তাহার উপর দুই-তিন রকমের নেশা। নেশার ঘোরে কোন দিন যদি রাগ করিয়া তাহার কচিমেয়েকে লাথি মারে ত' সেইদিনই সে মরিয়া যাইবে।...কথাটা মনে পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল। না, তা সে পারিবে না, তাহার চেয়ে মেয়ের হাত ধরিয়া পথে পথে ভিক্ষা করাও ভাল—!

কিন্তু এখন আবার নূতন করিয়া কোথাও পত্তন করাও ত' কম হাঙ্গামা নয়! সব জায়গাতেই আজকাল দোকানদারের প্রাচুর্য্য—যদি ব্যবসা না জমে? ঐ ক'টা টাকা ত সম্বল মোটে!...

বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিয়াও সে কোন কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে অনেক রাত্রে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া যখন সে ঘরে ফিরিল, তখন ন'টা পয়সাও বিক্রী হয় নাই, অথচ সকাল হইতে ঠাট সাজাইয়া বসিয়া থাকিতে শুধু কয়লাই পুড়িয়াছে বোধ হয় ন'পয়সার বেশী।

ঘরে তখনও পুঁটি ভাত লইয়া বসিয়া আছে। সর্ব্বেশ্বর হাত-পা ধুইয়া পিঁড়িতে বসিতেই সে ভাত বাড়িয়া দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, তারপর এদিকের কি করছ?

তাহার বাবা কোন জবাব দিল না। পুঁটি আবারও কহিল, এমন ক'রে আর ক'দিন চলবে?…পয়সাকড়ি ত' সব শেষ হয়ে গেল। কয়লাও'লা আর কয়লা দেবে না বলেছে—সে পয়সাও যোগাড় রেখো—

সর্ব্বেশ্বর কহিল, কয়লা নিয়েই বা হবে কি? কাল থেকে আর ঝাঁপ খুল্‌ব না, মিছিমিছি বসে থেকে লাভ কি?

পুঁটি কহিল, কি করবে তাহ'লে?

সর্ব্বেশ্বর কিছুক্ষণ নীরবে ভাত খাইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে জবাব দিল, মনে করেছি এখানে থেকে চলে যাব।

কোথায়?

যেখানে হোক্। কাটোয়া গেলেও হয়। কাছারীর ধারে গিয়ে বসলে কি আর দুটো পেট চলবে না?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুঁটি পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, পয়সা পাবে কোথায়? যাওয়া, দোকান সাজিয়ে বসা, খরচা ত' কম নয়!

দেখি—। না হয় তোর মায়ের ঐ ধূলোগুঁড়ো যা আছে, বেচে দিতে হবে। ভেবেছিলুম, ওগুলো তোর বিয়েতেই দেব, তা আর হ'ল না।

সে উঠিয়া পড়িল। পুঁটিও আর কোন কথা কহিল না। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ভাত খাইয়াই শুইয়া পড়িল।…

দোকান আর খুলিবে না, প্রতিজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও পরের দিন সর্ব্বেশ্বর স্থির থাকিতে পারিল না। আবার উনানে আঁচ দিয়া থালা-বাসন সাজাইয়া বসিল। এধারে পুঁটিও ঘরে তালা দিয়া প্রতিদিনের অভ্যাসমত

বাহির হইয়া পড়িল। প্রতি সোমবার নদীর ধারে হাট বসে, সুতরাং সোমবার হইলেই সে হাট সারিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইত, সেইজন্য ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইত। সেদিনও সে যখন ফিরিল তখন নটার গাড়ীটা চলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাজারের পুঁটুলীটা নামাইয়া তালা খুলিয়া দেখিল যে ইতিমধ্যেই ওপাশের বেড়া কাটিয়া কে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। বিছানার নীচে হইতে তোরঙ্গটা বাহিরে আসিয়াছে, তাহার তালা ভাঙ্গা, জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়ানো এবং তাহার মধ্যে যে ছোট ক্যাশ বাক্সে তাহার মায়ের গহনা ও দুই-একটা টাকা থাকিত সে বাক্সটিও নাই।

দিন-দুপুরে এ কাজ কাহার দ্বারা সম্ভব হইল তাহা পুঁটিরও বুঝিতে বাকী রহিল না। সে কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দোকানে গিয়া বাবাকে খবর দিল।

কথাটা প্রথমে কিছুক্ষণ যেন সর্ব্বেশ্বরের মাথাতেই গেল না, কারণ অযোধ্যা আর যাহাই করুক এতবড় সর্ব্বনাশ সে করিতে পারিবে একথা সর্ব্বেশ্বর কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেও উঠিয়া আসিয়া এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আবার তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া দোকানে বসিল, একটি কথাও কহিল না, কিংবা দুপুর বেলা ঘর-দুয়ার গুছাইরা রান্না শেষ করিয়া পুঁটি যখন ডাকিতে আসিল, তখন ভাতও খাইতে গেল না।

পুলিশে খবর দিয়া কোন লাভ নাই তাহা সে জানিত। ওপক্ষে অযোধ্যা পাঁড়ে আছে জানিলে কোন দারোগাই তাহার চুরির কথা কানে তুলিবে না। এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে এবং আজই! রাত্রিশেষে কাহাকেও না জানাইয়া—নহিলে আরও কি বিপদ বাধিবে কে জানে!

সে অপরাহ্ণের দিকে পুঁটিকে ডাকিয়া বলিল, যা দু-একখানা কাপড়-চোপড় আর বাসন-কোসন আছে, গুছিয়ে পুঁটুলি বেঁধে নে, আজই ভোর

বেলা পালাতে হবে। তোরঙ্গ বিছানা পড়ে থাক্—ওসব নিয়ে যেতে গেলেই জানাজানি হয়ে পড়বে।

পুঁটি কহিল, কিন্তু যাবে কোথায়? যা কিছু ছিল সবইত নিয়ে গেল!

সর্ব্বেশ্বর জবাব দিল, বামুনের ছেলে না হয় ভিক্ষেই করব, কিন্তু এখানে থাকলে শেষে তাও জুটবে না।

তাহার কণ্ঠস্বর যেন শেষের দিকে কাঁপিয়া গেল।

পুঁটি আর কথা কহিল না, দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ঘরেও ফিরিয়া গেল না। কিছুক্ষণ একটা আম গাছের তলায় বসিয়া বসিয়া মাটিতে দাগ কাটিল, তাহার পর সহসা উঠিয়া গাঙ্গুলীদের আম বাগানেরই মধ্য দিয়া একেবারে আসিয়া হাজির হইল অযোধ্যা পাঁড়ের বাড়ীতে—

অযোধ্যা তখন সবে আহার শেষ করিয়া বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে। সে এ বাড়ীতে একাই থাকে। এক ঠিকা ঝি আছে শুধু দুই বেলা কাজ করিয়া ফিয়া চলিয়া যায়, আর রাত্রে ক্যাব্‌লা আসিয়া বাহিরের ঘরটায় শুইয়া থাকে, এই মাত্র। এক বুড়ী পিসি ছিল কাণা এবং কালা, সম্প্রতি সেও মরিয়া গিয়াছে।

অযোধ্যা হুঁকা হাতে করিয়া সবে বিছানায় বসিয়াছে, এমন সময় পদশব্দ কানে গেল! সে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল পুঁটি—আরও বিস্মিত হইল। হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া অকারণেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সম্ভাষণের কোন কথাই কহিতে পারিল না।

পুঁটি অবশ্য বিশেষ অভ্যর্থনার অপেক্ষাও করিল না। বেশ স্পষ্ট করিয়াই তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, কেন মিছিমিছি আমাদের এমন ক'রে জ্বালাতন করছ? কী করেছি আমরা?

অযোধ্যা বিছানায় বসিয়া আবার হুঁকাটা তুলিয়া লইল। গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, হুঁ! তুই কি বুঝবি? ছেলে মানুষ!

পুঁটি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, বুঝেও দরকার নেই আমার! ছেলে মানুষ

যদি ত' তবে আবার বিয়ে করতে চাও কেন? বিয়ে করলে ত' আমিই গিন্নী হবো।

অযোধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, যা যা, ডেঁপোমি করতে হবে না—

পুঁটি কহিল, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকছো। বিয়ে করলে এর শোধ কি আমি না তুলব ভেবেছ? দু-বেলা চোখের জল ফেলিয়ে ছাড়ব—

অযোধ্যা চটিয়া উঠিল। চোখ পাকাইয়া কহিল, তোর যে বড় সাহস বেড়েছে দেখছি মুখে লাগাম নেই?

পুঁটি সে ধমক গ্রাহ্যও করিল না। কহিল, যাক গে, আমার বাজে-কথা বলবার সময় নেই। আস্‌ছে শুক্কুরবার বিয়ের দিন আছে শুনেছি, তুমি পুরুত ডাকিয়ে সব ঠিকঠাক করো, আমি বিয়ে করব।

ইষৎ বিদ্রূপের স্বরে অযোধ্যা কহিল, তোর বাপ এখন রাজী হ'ল কেন?

পুঁটি জবাব দিল, বয়ে গেছে বাবার রাজী হবার জন্যে! তেমন বামুনের ছেলে সে নয়। ভিক্ষে ক'রে খাবে তবু ছোট হবে না—

বিস্মিত হইয়া অযোধ্যা বলিল, তবে?

তবে আবার কি? এমন ক'রে তোমরা শয়তানী ক'রে বাবাকে পথে বসালে, বুড়ো মানুষ এখন কোথায় যাবে বলো ত'? সত্যি-সত্যি কি ভিক্ষে করবে? তাই আমি নিজেই বলছি। বাবা জানে না—

সে আর কোন কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। অযোধ্যা তাড়াতাড়ি দালানের বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল, তোর বাবা যদি তখন বিয়ে না দেয়?

গম্ভীর কণ্ঠে পুঁটি জবাব দিল, বলছি ত' আমি নিজিই করব।

সে চলিয়া গেল অযোধ্যা সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সর্ব্বেশ্বর এসব কথার কিছুই জানিত না, সে তেম্‌নিই শূন্য দোকান আগ্‌লাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সহসা অপরাহ্ণের দিকে অযোধ্যা

আসিয়া তাহার চৌকীটার উপর বসিয়া পড়িল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, একটু তামাক ধরা সর্ব্বেশ্বর, অনেকক্ষণ খাই নি—

সর্ব্বেশ্বর প্রথমটা তাহার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করিতে পারিল না। তাহার পর যখন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যে এ অযোধ্যাই, তখনও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, উহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। চারিদিকের অন্য দোকানদারও মজা দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া বসিল। সর্ব্বেশ্বর যে কথা কহিল না, তাহা বোধ করি অযোধ্যা লক্ষ্যও করিল না, কহিল, তোর ঐ একফোঁটা মেয়ের বড় তেজ হয়েছে জানিস সর্ব্বেশর, ও আবার আমাকে শাসন করতে গিয়েছিল।

সর্ব্বেশ্বর এতক্ষণে যেন কোথায় আলো দেখিতে পাইল। সে এই বার একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল; অযোধ্যা কিন্তু বলিয়াই চলিল, আবার বলে কিনা 'আমায় বিয়ে করো!' বাবা, ঐ ডেঁপো খাণ্ডারণী মেয়েকে বিযে করব আমি? বয়ে গেছে!…কিন্তু ওকে বেশী দিন আইবুড়ো রাখা ঠিক নয়, বুঝলি, ও বড্ড মদ্দাটে হয়ে উঠেছে। শিগ্‌গির বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর্—

সর্ব্বেশ্বর এতক্ষণে জবাব দিল, কী দিয়ে ব্যবস্থা করব শুনি। যা বিশ-পঞ্চাশ টাকা ছিল, তাও ত' কেড়ে নিলি—

অযোধ্যা ধমক দিয়া কহিল, যা যা, ভারি ত' জিনিষ ছিল, তারই শোকে গেলি একেবারে …সে ব্যবস্থা হবে এখন। ছেলেও আমি দেখে রেখেছি—বড়ুয্যেদের রমেন, ও শুনেছি ছেলে ভাল, একটা পাশও করেছে। কোলকাতায় কি একটা চাকরীও করে শুনছি। ওর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চালা খরচ যা পড়ে আমি দেব।…বাব্বা, ও মেয়েকে পার করতে না পারলে আমার শান্তি নেই, কোন্‌দিন সত্যিই হয়ত জোর ক'রে আমাকে বিয়ে ক'রে ফেলবে—

সর্ব্বেশ্বরের চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

উৎসর্গ

অরুণ তাহার প্রকাশকের নিকট হইতে বাড়ি ফিরিল নয়টারও পরে। ক্লান্ত পদে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া যখন নিজের ছোট ফ্ল্যাটটিতে সে চাবি খুলিয়া ঢুকিল, তখন যেন আর আলো জ্বালিবার মতও দেহের অবস্থা নাই। অবশ্য আলো জ্বালিবার খুব বেশী প্রয়োজনও ছিল না, পূবের জানালায় শুধু সার্শি দেওয়া ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া প্রচুর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের মধ্যে প্রায় সব কিছুই আবছা দেখা যায়। সে পাঞ্জাবি ও গেঞ্জিটা খুলিয়া টাঙাইয়া রাখিল, তাহার পর ঘরের জানালাগুলি সব খুলিয়া দিয়া একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিল।

নীচে তখনও কর্ম্মমুখর কলিকাতা ঘুমাইয়া পড়ে নাই। তখনও ট্রাম-বাস পূর্ণ উদ্যমে চলিযাছে, দোকানপাটও সব বন্ধ হয় নাই। শহরের কর্ম্মব্যস্ততার এই মিলিত কোলাহল এতটা উপরে আসিয়া কেমন যেন মধুরই লাগে। নীচেকার উজ্জ্বল আলো এখানের চন্দ্রালোককে ম্লান করিতে পারে না, কিন্তু তাহার একটা রেশ এ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। বেশ লাগে অরুণের এ ব্যাপারটা। সে নিজেব একান্ত কাছে কলরব পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নির্জ্জনবাসেও তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই শহরতলীতে যায় নাই, শহরের জনতামুখর, এই বিশেষ ব্যস্ত রাজপথটিতেই আসিয়া ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়াছে।

ফ্ল্যাট তো ভারি! মোট দেড়খানা ঘর। ঘর বলিতে এই একটি, পাশে যে স্থানটি আছে তাহাকে আধখানা ঘর বলিলেও বেশি সম্মান করা হয়— চলন মাত্র, একটি ছোট টেবিল পড়িলেই আর নড়িবার উপায় থাকে না। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলি হইতে তিল তিল করিয়া স্থান বাঁচাইয়া এই অদ্ভুত তিলোত্তমা তাহার অদৃষ্টে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য এক পক্ষে তাহা

ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে, নহিলে পনেরো টাকা ভাড়ায় একটা পৃথক ফ্ল্যাটই বা মিলিত কোথায়? অরুণের এখন যা মানসিক অবস্থা, মেসের বাসা সে কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ শুধু একজন পুরুষকে ঘরও বড় একটা কেহ ভাড়া দিতে চায় না। আর যদি বা পাওয়া যায়ও, সে বড় গোলমাল।

তাহার চেয়ে এই-ই বেশ। পনেরোটি টাকা ভাড়া দেয়, আর এই বাড়িরই দারোয়ানকে দেয় সাতটি টাকা, সে দুই বেলা রান্না করিয়া দিয়া যায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সুতরাং মাছ মাংস সে খায় না, দিতেও পারে না; কিন্তু তাহাতে অরুণের বিশেষ অসুবিধা হয় না, নিরামিষই তাহার ভাল লাগে। আর একটি ঠিকা ঝি আছে, সে প্রত্যহ সকালে আসিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিয়া যায়। এই তাহার সংসার।

ইহার বেশি আজ আর সে চায়ও না, বরং এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বরাবর বজায় থাকিলেই সে খুশি। মাস-ছয়েক আগে এই ব্যবস্থার কথাও সে কল্পনা করিতে পারিত না। দুইটি কি তিনটি গোটা পাঁচ-ছয় টাকার টিউশনি সম্বল করিয়া যাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত, মেসের দুই বেলা ভাত এবং কোনমতে কোথাও একটু মাথা গুঁজিবার স্থান, এইটুকুই ছিল তাহার পক্ষে বিলাস।—একেবারে সম্প্রতি, মাত্র ছয় মাস আগে, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, চল্লিশ টাকা মাহিনার একটা মাস্টারি মিলিয়াছে, এবং চাকরিটা টিকিয়া যাইবে বলিয়াই সে আশা করে। অন্তত সেই ভরসাতেই সে মাস-তিনেক আগে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া লইয়াছে।

অবশ্য শুধু মাস্টারিই আজ তাহার একমাত্র অবলম্বন নয়, প্রায় বছর-দুয়েক আগে, গভীর বেদনা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে, উপার্জ্জনের আর একটা পথও হঠাৎ সে খুঁজিয়া পাইয়াছিল। খুব ছোটবেলার স্কুলের ম্যাগাজিনে সে কবিতা ও গল্প লিখিত, এতদিন পরে মানসিক অবসাদে যখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন সে সেই পুরাতন অভ্যাসের

মধ্যেই আবার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল। এবার আর কবিতা লিখিবার চেষ্টা করে নাই, শুধু গল্প। একে একে দুই-একটি সাময়িক-পত্রে সে গল্প ছাপাও হইল, ক্রমে তাহার দরুন পাঁচ টাকা সাত টাকা দক্ষিণাও মিলিতে লাগিল। সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর, আজ তাহাই মহীরুহে পরিণত হইয়াছে—বাংলা দেশের এক বিখ্যাত প্রকাশক একেবারে তিন শত টাকা দিয়া তাহার একখানি উপন্যাস লইয়াছেন, এবং সেটি ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ তাহারই শেষ কয় পৃষ্ঠার প্রুফ এবং বাকী এক শত টাকার চেক প্রকাশক দিয়াছেন।

অরুণ একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল। প্রুফটা দেখিতে হইবে, আলোটা জ্বালা দরকার। প্রকাশক মোহিতবাবু অনুরোধ করিয়াছেন, ইস্কুল যাবার পথেই ত' প্রেস পড়বে, যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে যাবার পথে প্রুফটা প্রেসে ফেলে দিয়ে গেলে বড্ড ভাল হয়। দশটার আগে পৌছলে কাল ছাপা শেষ হয়ে পরশু বইটা বেরিয়ে যেতে পারে।

প্রথম উপন্যাস বাহির হইবে। তাহার নিজের আগ্রহও বড় কম নয়। সে আলোটা জ্বালিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল মোহিতবাবুর আর একটা কথা, টাইটেলের চার পাতা বাদ দিয়েও আর দুটো পাতা বাঁচছে। 'উৎসর্গ' করার যদি কাউকে থাকে ত' লিখে দিন না। প্রথম বই আপনার, কাকে 'উৎসর্গ' করবেন ভেবে দেখুন।

কথাটা খুবই সাধারণ। কিন্তু ইহার পিছনে কতখানি অপ্রীতিকর চিন্তা এবং স্মৃতিই না জড়াইয়া আছে!

অরুণ আর আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিল না। নীচে কোলাহল-মুখর আলোকোজ্জ্বল রাজপথের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার চেয়ারেই আসিয়া বসিল। তাহার প্রথম বই কাহাকে

উৎসর্গ করিবে—এই প্রশ্নটার সামনাসামনি দাঁড়াইয়া আজ এই সত্যটাই সে গভীরভাবে উপলব্ধি করিল যে, পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই। আত্মীয় বন্ধু স্নেহভাজন, কোথাও এমন কেহ নাই যাহার হাতে তাহার বহু বিনিদ্র রজনীর ফল, বহু সাধনার বস্তু, এই বইখানি তুলিয়া দেওয়া যায়।

অথচ আজ তাহার সবই থাকিবার কথা। মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাবা সে অভাব জানিতে দেন নাই কখনই। অতি যত্নে মানুষ করিয়া, বি-এ পাশ করাইয়া অফিসেও ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন এবং সংসারে লোকের অভাব বলিয়া অনেক খুঁজিয়া সুন্দরী পুত্রবধূও ঘরে আনিয়াছিলেন। সেদিন জীবনকে রঙিন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু একটি বৎসর কাটিতে না কাটিতে কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! বাবা মারা গেলেন, তাহারই মাস কয়েকের মধ্যে হঠাৎ অফিসটিও উঠিয়া গেল। সেই যে চাকরি গেল—আর কিছুতেই কোথাও কোন কাজ মিলিল না! এক মাস, দুই মাস, বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বাবা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, সুতরাং একে একে নীলিমার গহনাগুলি সব গেল, তাহার পর ঘরের আসবাব-পত্র, সবশেষে বাসন-কোসন। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি ছোটখাটো টিউশনি হয়তো পায়, কিন্তু সে পাঁচ-সাত টাকার, তাহাতে খাওয়া-পরা বাড়ী-ভাড়া সবগুলি চলে না। বাড়ি ছাড়িয়া ফ্ল্যাটে আসিল, সেখান হইতে ভাড়াটে বাড়ির একখানা ঘর, নীচের তলায় অন্ধকার ঘর। তবু ভাড়া দেওয়া যায় না। অপমানের ভয়টা বড় বেশি ছিল বলিয়া বেশি ধার করিতে সে পারিত না। যাহা কিছু সামান্য পাইত কোনমতে ঘরভাড়াটা দিয়া দিত, সুতরাং নিজেদের ভাগ্যে দিনের পর দিন চলিত উপবাস।

উঃ, সে দিনের কথা মনে করিলে আজও বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়। শুধু নৈরাশ্য ও তিক্ততা। এতটুকু আশা, এতটুকু আনন্দের আলোও কোথাও নাই। সারা দিনই প্রায় কাজের চেষ্টায় ঘুরিত, গভীর রাত্রে

ক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিত, হয়ত নীলিমা তখনও শুষ্ক মুখে তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। আগে আগে সে প্রশ্ন করিত নয়ত একটু ম্লান হাসিত, ইদানীং তাহাও আর পারিত না। উপর্য্যুপরি উপবাসে তাহার প্রাণশক্তি গিয়াছিল ফুরাইয়া। দিনের পর দিন এই একই ঘটনা ঘটিয়াছে, তবু একটা কুড়ি টাকা মাহিনার চাকরিও সে জোটাইতে পারে নাই।

অরুণের আত্মীয়স্বজনরা দারিদ্র্য দেখিয়া বহুদিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন, নীলিমারও বিশেষ কেহ ছিল না; অসামান্য রূপ দেখিয়া নিতান্ত গরিবের ঘর হইতেই অরুণের বাবা তাহাকে আনিয়াছিলেন। সুতরাং এক বেলা আশ্রয় দিতে পারে, খাদ্য দিতে পারে, শেষ পর্য্যন্ত এমন কেহই যখন আর রহিল না, তখন কোন প্রকার ধার করা বা সাহায্য চাওয়ার চেষ্টাও অরুণ ছাড়িয়া দিল, তখন চলিতে লাগিল শুধু উপবাস। দুই দিন, তিন দিন অন্তর হয়তো ভাত জোটে, তাও এক বেলা।

অবশেষে নীলিমা আর সহিতে পারিল না। আশ্রয় দিবার আত্মীয় ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যথেষ্ট ছিল বলিয়া সর্ব্বনাশ করিবার লোকের অভাব ঘটিল না। অরুণের চরম দুর্দ্দিনে, তাহার ভার বহন করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া নীলিমা একদিন চলিয়া গেল! যাইবার সময় শুধু এক ছত্র চিঠি রাখিয়া গেল—

'আমি আর সইতে পারলুম না। আমাকে মাপ ক'রো। আমার ভার ঘুচলে তুমিও হয়ত এক বেলা খেতে পাবে।'

অরুণ অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথা দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে বাথরুমে গিয়া মাথায় খানিকটা জল থাব্ড়াইয়া দিল, তাহার পর মুখ-হাত মুছিয়া জোর করিয়া আলোটা জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাজ সারিতেই হইবে, বৃথা চিন্তা করিবার সময় নাই!

কিন্তু প্রুফ ছিল সামান্য, শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আবার সেই 'উৎসর্গের' প্রশ্ন। সামনে কাগজগুলা খোলাই পড়িয়া রহিল, টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নিঃশব্দে জ্বলিতে লাগিল, সে জানালার মধ্য দিয়া রাস্তার ওপারে আর একটা বাড়ির কার্নিস, যেখানে এক ফালি চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মন তাহার চলিয়া গিয়াছে তখন কত দূরে, অতীতের এক কুৎসিত কর্দ্দমাক্ত মেঘ-ঘন দিনে। সেখানে আলোর রেখা মাত্র নাই, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আজও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করে—

সেদিন হয়তো তাহার মরাই উচিত ছিল। নিজের স্ত্রী ভরণপোষণের অক্ষমতার জন্য যাহাকে ত্যাগ করিয়া যায়, সে আবার সেই কালামুখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে কি বলিয়া? কিন্তু মরিতে সে পারে নাই। হয়ত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু আসিলে সে আদর করিয়াই বরণ করিত, কিন্তু স্বেচ্ছায় জীবনটাকে বাহির করিতে সে পারে নাই, অত দুঃখের পরেও না। বরং গৃহস্থালীর সামান্য যে দুই-একটা তৈজস অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বেচিয়া একটা মেসে গিয়া উঠিয়াছিল, এবং নিজের মনেও স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা হয়, দুই বেলা ভাত খাইতে পাইয়া সে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিয়াছিল। সেই হইতে সে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসঙ্গ।

তাহার পর আবার একটু একটু করিয়া সে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে, আজ বরং তাহার অবস্থা স্বচ্ছলই, কিন্তু স্বচ্ছলতা একদিন যাহার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সেই জীবনসঙ্গিনীই গিয়াছে হারাইয়া। আজ আর এ স্বাচ্ছন্দ্যের যেন কোন মূল্যই নাই। কোথায় আছে সে কে জানে, সুখে আছে কি আরও দুঃখে আছে! কাহার আশ্রয়ে আছে তাই বা কে জানে, সে কেমন লোক! হয়ত বা বাঁচিয়াই নাই। দুঃখে, কষ্টে, দারিদ্র্যে—হয়ত অকালেই এ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে।

কথাটা ভাবিতেই অরুণের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বেচারী অত দুঃখই সহিল, আর কয়েকটা দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে হয়ত আর ইহার প্রয়োজনই হইত না। আজ এই স্বাচ্ছন্দ্যের সে-ও অংশ লইতে পারিত। আজ আর তাহার প্রথম উপন্যাস কাহাকে উৎসর্গ করিবে, এ প্রশ্ন উঠিত না। সে হয়ত আজও বাঁচিয়া আছে, অথচ এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না অরুণ কিছুতেই—

নীলিমাকেই সে উৎসর্গ করিবে নাকি শেষ পর্য্যন্ত? কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে?

দোষ কি?

চিন্তাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করিয়া দিল।

বেচারী নীলিমা, তাহারই বা অপরাধ কি? কি কষ্টটাই না করিয়াছে সে! দিনের পর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে, লজ্জা-নিবারণের কাপড় পর্য্যন্ত জোটে নাই। বহুদিন তাহাকে গামছা পরিয়া একমাত্র ছেঁড়া কাপড় শুকাইয়া লইতে হইয়াছে। তবু—তবু সে গঞ্জনার একটি শব্দও মুখ দিয়া উচ্চারণ করে নাই, কোন প্রকার অনুযোগ করে নাই। আগে হাসিমুখেই সব সহিয়াছে, ইদানীং হাসিতে পারিত না, তবু সহিয়াছে—নীরবে, নিঃশব্দে। ভাত জুটিলেও সে ভরসা করিয়া পুরা খাইতে পারে নাই, আবার স্বামী খাইবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত যদি সে একদিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াই থাকে তো সে এমন কিছু অপরাধ নয়।

অরুণ তাহার মনের মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া, আজ বোধ করি প্রথম লক্ষ্য করিল যে, সেখানে নীলিমার সম্বন্ধে কোন অভিমান কোন অনুযোগই আর অবশিষ্ট নাই। হয়ত আছে বেদনাবোধ, কিন্তু তাহার জন্য দায়ী তাহার নিজেরই অদৃষ্ট। যতদিন নীলিমাকে সে পাইয়াছে,

কখনও কোনও অভিযোগের কারণই তো ঘটিতে দেয় নাই। স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, লীলাচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ তাহার সেই কিশোরী বধূর কথা মনে পড়িলে আজও সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। না, যতদিন সে পাইয়াছে, আশ মিটাইয়া পাইয়াছে। এমন দুর্ভাগ্য খুব অল্প লোকেরই হয় বটে, কিন্তু এমন সৌভাগ্যও কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথম যৌবনের সেই নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার এক-একটি বিনিদ্র রজনীর যে মধুস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, শুধু সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই তো একটা জীবন স্বাচ্ছন্দে কাটিয়া যাইতে পারে। তবে তাহার কি কোন মূল্যই নাই, সেজন্য কোন কৃতজ্ঞতা নাই? অরুণের নিজের দোষে, অসীম দুঃখের ফলে একটি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যদি তাহার পদস্খলনই হইয়া থাকে তো সেইটাই কি সে মনের মধ্যে বড় করিয়া রাখিবে, আর অতখানি প্রেম, অতটা নিষ্ঠা, সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

না, মনের এই দুর্ব্বলতা, এই অন্যায় সংস্কারকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না, নীলিমাকে সে তাহার প্রথম বই উৎসর্গ করিবে।

নীচে তখন রাজপথ জনবিরল হইয়া গিয়াছে, দোকানপাট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোও হইয়া উঠিয়াছে ম্লান। শহরের অশান্ত বিক্ষুব্ধতার উপরে যেন চমৎকার একটি সুষুপ্তি নামিয়া আসিয়াছে, সমস্তটা মিলিয়া একটা করুণ অথচ মধুর শান্তি।

সে খানিকটা যেন কিসের আশায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ফ্ল্যাটে তখনও স্বামী-স্ত্রীর আলাপের গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, নীচে কোথায় একটা ছেলে কাঁদিতেছে একটানা সুরে। আর সব শান্ত স্তব্ধ।

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চেয়ারে বসিল, তাহার পর দৃঢ় হস্তে প্রুফের কাগজগুলা টানিয়া লইয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটি লিখিয়া দিল। বেশী কিছু নয়, শুধু—"শ্রীমতী নীলিমা দেবী, কল্যাণীয়াসু"।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলাই বই বাহির হইয়া গেল। প্রকাশক মোহিতবাবু এক কপি হাতে করিয়া রাত্রে আসিলেন তাঁহার রক্ষিতার বাড়ি। উপরে উঠিয়া তাহার সামনে বইখানা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এই নাও, তোমার সেই বই বেরিয়েছে।

সে বসিয়া কি একটা বুনিতেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়া রাখিয়া সাগ্রহে বইটা তুলিয়া লইল। চমৎকার বাঁধাই, উপরে রঙিন ছবি, তাহারই মধ্যে ঝকঝক করিতেছে বই ও লেখকের নাম। খানিকটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বইটা বিছানার পাশে একটা টিপয়ের উপর সযত্নে রাখিয়া দিয়া সে উঠিয়া মোহিতবাবুর স্বাচ্ছন্দ্যের তদ্বিরে মন দিল। চাদর ও জামাটা খুলিয়া তাহার হাতে দিতে দিতে মোহিতবাবু বলিলেন, বাবা বাঁচলাম! যা তাগাদা তোমার, ওই বইটা যেন আমার সতীন হয়ে উঠেছিল।

তাহার পর নীচের ঢালা বিছানাটায় দেহ এলাইয়া দিয়া কহিলেন, রামটহল গেল কোথায়? একটু তামাক দিতে বলো।...বেরুল তো, এখন খরচটা উঠলে বাঁচি। তোমার কথা শুনে একগাদা টাকা দিয়ে বইটা নিলাম, ওর আদ্ধেক টাকাও কেউ দিত না।

ও পক্ষ তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, নিশ্চয়ই উঠবে। অত ভাল লেখা, লোকে নেবে না?

মুখটা বিকৃত করিয়া মোহিত কহিলেন, কে জানে কি লেখা, আমি কি আর কোনটা পড়েছি ছাই। তুমি খালি ওর নাম করতে গ'লে পড়ো।

হ্যাঁ গো মশাই, শুধু বুঝি আমি? ভালই যদি না হবে, তা হ'লে অতগুলো মাসিক-পত্র ওঁর লেখা ছাপে কেন?

মোহিতবাবু একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, ওদের

তো ভারী বুদ্ধি, ওরা যা পায় তাই ছাপে।···তোমারও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, যতগুলো কাগজ অরুণবাবুর লেখা ছাপে, সবগুলোই তো তুমি নিতে শুরু করেছ দেখছি।

কি করব, একলা একলা সময় কাটে কি ক'রে আমার? তুমি কিচ্ছু ভেবো না, ও বই নিশ্চয়ই ভাল বিক্রি হবে। সব কাগজে পাঠিয়ে দাও, দেখবে, ভাল সমালোচনা বেরুলেই বিক্রি হ'তে শুরু হবে।

হ'লেই বাঁচি। একেবারে নতুন লেখক, ভয় করে বড্ড।

মোহিতবাবু খানিকটা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন। একটু পরে রামটহল তামাক দিয়া যাইতে, উঠিয়া বসিয়া গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা ভারী মজার ব্যাপার বলতে ভুলে গেছি। শুনেছ, ওর বউয়ের নামও নীলিমা।

নীলিমা হেঁট হইয়া জল-খাবারের থালা রাখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, কে বললে?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন, ওই দেখনা বইটা খুলে, উৎসর্গ করেছে তার নামে।

নীলিমা তাড়াতড়ি বইটা খুলিয়া উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা বাহির করিল। মিনিটখানেক সেদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু ও যে ওঁর বউয়েরই নাম, তা কেমন ক'রে জানলে?

মোহিতবাবু মুখ হইতে নলটা সরাইয়া বলিলেন, বললে যে। নামটা দেখে ভারী মজা লাগল। বলতে তো পারি না কিছু, ওঁকেই জিজ্ঞসা করলাম, ইনি কে মশাই? অরুণবাবু জবাব দিলেন, 'আমার স্ত্রী।' অদ্ভুত মিল, না?

নীলিমা কোন উত্তর দিল না। তখনও তাহার চোখের সামনে সেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠাটা খোলা, কিন্তু অক্ষরগুলি তখন আর চোখে পড়িতেছিল না, সব যেন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

আরও মিনিট-দুই পরে বইটা বন্ধ করিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, দেখি, তোমার চা-টা নিয়ে আসিগে—

কিন্তু তখনই সে নীচে গেল না। ওপাশের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ গলির উপরের এক ফালি অন্ধকার আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কে জানে কাহার উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মোহিতবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

সত্যভাষণ

প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত আসে যখন পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় তাহাদের হৃদয়ের পাত্র একেবারে পূর্ণ হইয়া ওঠে এবং বিহ্বল মুহূর্ত্তে তাহারা সে ভালবাসার আতিশয্য প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। অকারণ স্বার্থত্যাগ, অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, নানারূপ আত্মনিপীড়ন প্রভৃতি নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়াই প্রায় সে আতিশয্য প্রকাশ পায়—আর সেই জন্যই অনেক সময়ে তাহারা সাধ করিয়া ডাকিয়া আনে দুঃখ!

আমাদের ললিত আর কল্যাণীর জীবনেও সেদিন এমনি একটি মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল।

সেদিন পূর্ণিমা, ললিত অফিসের ফেরত একটা রজনীগন্ধার মালা কিনিয়া আনিয়াছিল। সেই মালাটি ছিল পাশে একটি রেকাবীতে সাজানো; ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিল স্বামী আর স্ত্রী, পাশাপাশি—নিবিড়ভাবে। ললিত তখনই সাবান দিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদু সৌরভ কল্যাণীর প্রসাধনের গন্ধ ও রজনীগন্ধার গন্ধের সহিত মিশিয়া কেমন একটা মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, দুজনেরই চোখে নামিয়াছে স্বপ্নের ছায়া। ছোট বাড়ী, অন্য ভাড়াটে নাই, আছে এক ঝি, সে নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ!

সহসা কল্যাণী ললিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, যে জীবনে এত সুখ আছে, বাস্তবিক তা কখনো ভাবিনি। উঃ, বিয়ের সময় কী কান্নাটাই কেঁদেছিলুম; সাহসে কুলোয়নি তাই, নইলে হয়ত আত্মহত্যাই ক'রে বসতুম!

সজোরে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ললিত মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন রাণু, আমাকে কি তোমার আগে পছন্দ হয়নি?

কল্যাণী খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি তোমার বুদ্ধি গো। তোমাকে আগে দেখলুম কোথায় যে পছন্দ হবে!

তা বটে। ললিত তাহার খোঁপার মধ্যে মুখটা গুঁজিয়া কহিল, তবে? তা হ'লে এর আগে আর কাউকে পছন্দ হয়েছিল বলো।

কল্যাণী সুখের আবেগে হাতটা উল্‌টা দিকে ঘুরাইয়া ললিতের গলাটা জড়াইয়া রাখিয়াই তাহার বুকে এলাইয়া পড়িয়া কহিল, বা-রে ছেলে! আমার গোপন কথাটি বুঝি ফাঁকি দিয়ে বার ক'রে নিতে চাও? তোমার কীর্ত্তি আগে না শুনে আমি কিছু ভাঙ্গছি না!

তাহার পর আব্‌দারের হাসি হাসিয়া কহিল, সত্যি বলো না গো, তুমি আমাকে বিয়ে করবার আগে ক'জনকে ভালবেসেছিলে?···কথাটা মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমাকে দেখলেই সব ভুলে যাই ব'লে কোন দিনই আর জিজ্ঞাসা করা হয় না—

ললিত জবাব দিল, হ্যাঁ, আগে জিজ্ঞাসা করলেই বলতুম কি-না!··· তবে এখন বল্‌তে পারি। আর কোন বাধা নেই!

কৌতুকহাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কল্যাণী কহিল, বলো না তবে। তিনজন, চারজন, না আরও বেশী?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল, সে বরাত ক'রে এসেছি কি না! মোটে একটি, আমারই দিদির ননদ। পাটনা থেকে এসে আমাদের বাড়ীতে মাস দুই প্রায় ছিল। জমেছিল বেশ। একই বাড়ীতে চিঠি লেখালেখি চলত হরদম। ওরা যখন চলে যায়—আমি মাকে বলেছিলুম—ওকে না পেলে আমি বিয়েই করব না। সেও না-কি সেখানে আমার দিদিকে বলেছিল যে আমাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

তারপর?

ললিত হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, যেমন হয়ে থাকে! সে-ও

এখন দিব্যি স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ঘরকন্না করছে—আর আমি তোমাকে এই বুকে জড়িয়ে ধরে আছি !

কল্যাণী কহিল, তাই বটে। ঐ রকমই তখন মনে হয়। আমারও ঠিক বিয়ের আগে দাদার এক বন্ধুকে দেখে মনে হয়েছিল ওকে না পেলে বাঁচব না। মনে মনে সাবিত্রীর মত প্রতিজ্ঞা করবার চেষ্টা করতুম যে ঐ আমার স্বামী, 'অন্যপতি নাই !'

একটু থামিয়া আবার কহিল, ইস্—কি এঁচোড়ে পাকাই ছিলুম তখন। কত রকম নাটক যে করতুম মনে মনে, তার ঠিক নেই।···সে ছোঁড়াও তেম্‌নি, সবে মেডিকেল কলেজে ঢুকেছে তখন—পড়াশুনো সব ছেড়ে শুধু আমাকে দেখবার জন্যে বাড়ীর চার পাশে ঘুরে বেড়াতো। তেম্‌নি হ'লো, ফার্স্ট ইয়ারেই দু'বার ফেল !···এখন শুনছি ডাক্তারী পড়া ছেড়ে কোথায় চাকরি করছে।

দু'জনেই খানিকটা হাসিয়া উঠিল। তাহার পর মিনিট কয়েক একেবারে চুপচাপ, দুজনেই মনে মনে কি ভাবিতেছিল। কল্যাণী একটু পরে ললিতের গলাটা ছাড়িয়া দিয়া তাহারই কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, ছেলেবেলায় মানুষ যেন কী এক রকম থাকে ! না ?

ললিত অন্যমনস্কভাবে কহিল, হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো ছেলেমানুষী বলে—

আবার কিছুক্ষণের জন্য দুজনে চুপ করিল। আবেগের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এখন তাহার পরের শান্ত অবস্থা।

তাহারা যে চুপ করিয়া আছে, অকস্মাৎ মিনিট দশের পরে দুজনেই এক সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিল। ললিত একটু শব্দ করিয়াই হাই তুলিল ; কল্যাণী কহিল, বাতাস একদম নেই, কেমন যেন গরম বোধ হচ্ছে, না ?

ললিত কল্যাণীর চুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল চালাইয়া কহিল, তোমার মাথা ঘামে ভিজে উঠেছে যে !···টেবিল ফ্যানটা এনে খুলে দিলে না কেন ?

থাক্ গে। আর উঠতে ভাল লাগ্‌ছে না।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল, তোমার এই সামানের শুক্রবার কিসের ছুটি আছে বলছিলে ?

এমনিই দুই-একটা খুচরা আলাপ চলিল। কোথা দিয়া কেমন করিয়া সামান্য একটু সঙ্কোচের স্বর যেন কথাবার্ত্তার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে; অথচ তাহারা সে কারণটা তখন ভাবিতেও প্রস্তুত নয়।

আরও মিনিট কতক পরে ললিত কহিল, চলো, খেযে দেয়ে নিই—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কল্যাণী উঠিয়া পড়িল, কিন্তু জবাব দিল, কি ভাগ্যি! রোজ বারোটার আগে খেতে চাও না! আজ ঐ ভয়ে আমি ঝিকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, সে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়।

ললিত কিছু না বলিয়া মালাটা লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরের দিন সকালে ললিত আহারে বসিয়াছে, কল্যাণী একটা পাখা লইয়া কাছে আসিয়া বসিয়া কহিল,—হ্যাঁগো, আমাকে একবার পাটনায় নিয়ে যাবে ?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, পাটনায় ? এত দেশ থাকতে পাটনা যাবার সখ হ'লো কেন হঠাৎ ?

মাথা নীচু করিয়া কল্যাণী কহিল, এমনি—। না হয় একবার সেই মেয়েটিকে দেখে আসতুম !

আরও বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, মেয়ে ? কোন্ মেয়ে ?

তোমার দিদির সেই ননদ—

ওহো! ললিত হাসিয়া কহিল, কি তোমার বুদ্ধি। সে-ও বুঝি পাটনায় থাকে ? তার বিয়ে হয়নি ? শ্বশুরবাড়ী নেই ?

কল্যাণী কহিল, তার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

কৈ মাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে ললিত কহিল, ঐ দিকেই কোথায় —দারভাঙ্গা না মতিহারী—ঠিক জানি না।

কল্যাণী চুপ করিল। ললিতও তখনকার মত কথাটা ভুলিয়া গেল। কিন্তু অফিসের নির্জ্জন অবসরে কথাটা মনে পড়িতেই কল্যাণীর প্রশ্নের আড়ালে যে একটু ঈর্ষার স্বর আছে সেটা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ললিত কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করিল—কল্যাণীর মধ্যেও নীচতা আছে, ছি !

সে বাড়ী ফিরিল একটু গম্ভীর মুখে। কল্যাণী অসিয়া পাখাটা খুলিয়া দিল, অভ্যাসমত হাত হইতে জামা-গেঞ্জিও লইল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত উচ্ছ্বাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল না। একটা কি যেন ঠাট্টার চেষ্টা করিয়া পরক্ষণেই সংসারের কথা পাড়িল, ওগো, ঝি বলছে দেশে যাবে আসছে মাসে—

—তাই তো। তা ও-ই একটা লোক দিয়ে যেতে পারবে না ?

কল্যাণী কহিল, বলছে তো পারবে না। কি যে হবে, মুশকিল !

সেদিনও চাঁদ উঠিল। কিন্তু তাহারা ছাদে গেল না। ললিত ঘরেই একটা বই লইয়া শুইয়া পড়িল। কল্যাণীর রান্নাঘরের কাজ সকাল করিয়াই সারা হইয়া যায়, সে-ও একটা কি সেলাই লইয়া ললিতেরই কাছে আসিয়া বসিল। কালকের মতই পাশাপাশি, কিন্তু সে আবেগ আজ আর যেন নেই। কল্যাণী দুই-একটা কথা কহিল, ললিত বই পড়িতে পড়িতেই উত্তর দিল। এম্নি করিয়াই অবশেষে এক সময়ে আহারেব সময় হইল।

পরের দিনও এই ভাবে কাটিয়া গেল। সেদিন দুজনেই সহজ হইবার চেষ্টা করিল, রসিকতার প্রয়াসও চলিল—কিন্তু কোথায় যেন বারবার তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা নিজেদের মনের কাছেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, সব আর ঠিক আগের মত অনায়াসে

চলিতেছে না; জীবনের যন্ত্রে কোথায় একটা বেস্থরা তার কে যোগ করিয়া দিয়াছে—

দুজনেরই রাগ হইল। একটা সহজ কথা, সহজভাবে স্বীকার করিবার উপায় নাই? সে তো কতদিনকার কথা, তাহার পর কত ঘটনা ঘটিয়া গেছে—সেকথা আজ মনেও নাই। কথা উঠিল তাই, নহিলে নিজেদেরই মনে পড়িত কি-না সন্দেহ।

অভিমান ললিতেরই বেশী, কারণ তাহার মনে সঙ্কোচ থাকিলেও সে তাহা স্বীকার করে নাই। কল্যাণীই নীচতা প্রকাশ করিয়াছে—অকারণে। তাহার এত ভালবাসার পরও এমন একটা তুচ্ছ সন্দেহ সে করিতে পারিল, আশ্চর্য্য!

কল্যাণীও অভিমান ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল না। নিজের দোষও বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাকেও সে ভুল বুঝিল। তাহাকে সে মনে করিল—তাহার প্রতিই অবিচার, ফলে সে-ও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। যেন অভিমান সব কিছু তাহারই প্রকাশ করিবার কথা—বেদনা বা অপমান বোধ করিবার কারণ ঘটিয়াছে কেবলমাত্র তাহারই!

এমনিভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিবার পর সঙ্কোচ বা অভিমান যখন মনোমালিন্যের রূপ ধরিতে চলিয়াছে, তখন সহসা একদিন সন্ধ্যার পর ললিত যেন ফাটিয়া পড়িল। কল্যাণী রান্নাঘরে তখন রান্না করিতেছে, সেইখানে আসিয়া সে উষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার দেরাজের কাগজপত্র ঘেঁটেছিলে কেন?

কল্যাণী যেন চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে কহিল, কে বললে?

ললিত কঠিনভাবেই জবাব দিল, কে বললে সেটা তো বড় কথা নয়। কেন হাত দিয়েছিলে সেইটাই জিজ্ঞাসা করছি—

কল্যাণী কড়ায় কি একটা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, আমার একটা দরকারী চিঠি খুঁজে পাচ্ছিলুম না তাই—মনে করেছিলুম তোমার কাগজপত্রের মধ্যে থাকতে পারে।

মিছে কথা! ললিত বলিল, তুমি আমার পুরোনো চিঠির বাণ্ডিল খুলে পড়তে গিয়েছিলে—

কল্যাণী যেন আগুনের মতই জ্বলিয়া উঠিল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, বেশ করেছি। কি করবে তুমি তার জন্যে, মারবে?

ললিত বলিল, মারব না। কিন্তু তুমি কত নীচ তাই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতদিন তোমায় ভুল বুঝেছিলুম।

—আমি নীচ? কল্যাণী চেঁচাইয়া উঠিল, আর তুমি কি? তুমি আমার দাদার কাছে গিয়ে তার এ্যাল্‌বাম দেখতে চাওনি? ভেবেছ আমি কিছু জানি না, না?

সহসা একটা কড়া জবাব যেন ললিতের মুখের কাছ হইতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া গেল। সে বার-দুই অন্য কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলিয়া ফেলিল, বাঃ, এরই মধ্যে গোয়েন্দাগিরিও শুরু হয়ে গেছে বুঝি? বেশ, বেশ, বরং পুলিশে দরখাস্ত ক'রে দিও—ভাল চাকৃরি মিল্‌বে!

সে আর দাঁড়াইল না, আবার উপরে উঠিয়া চলিয়া গেল। কল্যাণীও সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে রাত্রে দুজনের কাহারও খাওয়া হইল না।

ব্যাপারটার কদর্য্যতায় ললিত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মস্তিষ্কে যতই সে ভাবিতে লাগিল—ততই বুঝিল যে অপরাধ তাহার কম নয়, অথচ সে-ই প্রথম কল্যাণীকে গালি-গালাজ করিয়াছে। তাহার

অনুতাপের সীমা রহিল না, পরের দিন নিজেই উপযাচক হইয়া কল্যাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বিবাদটা মিটাইয়া লইল।

ইহার পর আবার সহজ জীবনযাত্রা শুরু হইল। সহজ, কিন্তু স্বচ্ছন্দ নয়। কিছুতেই যেন ঠিক আগের মত প্রাণের পাত্র কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠে না, আগের মত সহজে মেলা যায় না। কোথায় যেন আট্কায়।

মাসখানেক পরে সহসা ললিত একটা ট্যুইশন্ লইল। এই কাজটায় আগে সে বন্ধুবান্ধবদের বহু অনুরোধেও রাজী হয় নাই। কল্যাণী অভিযোগ করিল, অফিসের ঐ খাটুনি—তার ওপর আবার ছেলে পড়ালে শরীর কতদিন টিক্‌বে ?

ললিত কহিল, বেশী খাটুনি হবে না,—ছেলেটা ভালো আছে। টাকাটাও কম নয়, দেখি না চেষ্টা ক'রে—

কল্যাণী কথা কহিল না। ইহা যে সন্ধ্যার নীরব অবসর অন্যত্র কাটাইবারই উপলক্ষ্য মাত্র, তাহা বুঝিতে পারিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। কিন্তু তাহার দিন কাটাইবার উপায় কি ? ছেলেমেয়ে নাই, কাজও বেশী নয়—একা এই বাড়ীতে রাত্রি দশটা অবধি কিছুতেই যেন কাটে না। এক এক দিন তাহার অসহ্য বোধ হয়, বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসে—

অবশেষে একদিন রাত্রে ললিতের কাছে কথাটা না পাড়িয়া পারিল না। কহিল, আমাদের তো নীচের তলার ঘরটা কোন কাজেই আসে না, ওটার জন্যে একটা ভাল ভাড়াটে দেখ না—ছোট সংসার—শুধু স্বামী-স্ত্রী, এমন পাওয়া যায় না ?

বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, তা যায়। কিন্তু এইটুকু বাড়ীর মধ্যে আবার কতকগুলো অচেনা লোক এসে ঢুকলে কি এখানে বাস করতে পারবে। না না, সে বড় অশান্তি হবে—

কল্যাণী কহিল, কিন্তু একা একা আমার এই বাড়ীতে কি ক'রে কাটে বলো দেখি? এমন ক'রে আমি যে আর পারি না!

ললিত বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বোধহয় অনেকদিন পরে কল্যাণীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—এমন ক'রে আমিও আর পারি না। রাত অবধি বাইরে ঘোরা আমার কিছুতে সহ্য হয় না।...আমাকে তুমি কাছে ডেকে নাও না রাণী আবার—

অশ্রু ছলছল চোখে কল্যাণী কহিল, আমিই কি তা হ'লে তোমাকে তাড়িয়েছি?

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল—না না, দোষ আমারও কম নয়। কিন্তু কি তুচ্ছ কারণে হঠাৎ আমাদের সুখের বাসা ভাঙ্‌ল ভেবে দেখ দিকি রাণী, কী থেকে কি হ'লো!

কল্যাণী তাহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কহিল, সত্যি, কেন যে মরতে ও কথাগুলো বল্‌তে গিয়েছিলুম তা জানি না। ওগুলো কি একেবারে ভোলা যায় না?

নিশ্চয়ই যায়। জোর করিয়া কল্যাণীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ললিত কহিল, কিন্তু তার আগে একটা কথা আজ তুমি বিশ্বাস করো রাণু, সেদিনকার সেই কথাটা আমার আগাগোড়া বানানো, ঝোঁকের মাথায় একেবারে মিছে কথা বলেছিলুম।

কল্যাণী ললিতের বুকের মধ্যেই চমকিয়া উঠিল। তাহার সজল চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, উঃ, একদম ফাঁকা ব্যাপার নিয়ে দুজনে কি কষ্টই পেলুম।...তুমিও যদি সেদিন আমার দাদার কাছে এ্যালবাম দেখতে না চেয়ে খোলাখুলি কথাটা জিজ্ঞাসা করতে তো জানতে পারতে যে দাদার কোন বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয়

পর্য্যন্ত ছিল না, ভালবাসা তো দূরের কথা।···কথাটা ঝোঁকের মাথায় তখনি-তখনি বানানো।

ললিত জোরে হাসিয়া কল্যাণীকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল, কল্যাণীও হাসি-অশ্রু-মাখানো মুখে তাহার গলা জড়াইয়া বুকে মাথা রাখিল।

এম্‌নি ভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত দুজনে বসিয়া বসিয়া অনেক দিন পরে সহজভাবে অনেক গল্প করিল। তাহারা প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে তাহাদের মন হইতে সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছে, আজ আবার তাহারা পরস্পরের কাছে আগেকার মতই সহজ। কিন্তু তবু তাহারা দুজনেই মনে মনে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, পরস্পরের এই সত্যকার সত্যভাষণটা দুজনের কেহই আজ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

নব-বধূ

অকস্মাৎ নিচের তলা হইতে তুমুল ঝগড়ার আওয়াজটা আসিতে ইন্দিরা যেন বাঁচিয়া গেল। সকলেই দুড়-দুড় করিয়া নীচে নামিয়া যাইতে সে এতক্ষণে একটু একা থাকিতে পারিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

বাড়ীতে পা দিবার সময়ই সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন, তবু তখন গুরুজনরা দলে ভারী ছিলেন বলিয়া ছোটরা ঘেঁসিতে পারে নাই। তাঁহাদের দৃষ্টির পরীক্ষাটাই চলিয়াছিল বেশী, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মৃদু মন্তব্য ; কিন্তু কড়ি খেলা প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট-ছোট দেওর-ননদ ভাগ্নে-ভাগ্নী ভাসুরঝি প্রভৃতির দল সেই যে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত একটু নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ দেয় নাই। তাহাদের প্রশ্ন চলিয়াছে অবিরাম, তাহার অধিকাংশই হয়ত ছেলেমানুষী কিন্তু তবু তাহার সবগুলির উত্তর দিতে গেলে বিব্রত হইতে হয়।

ইন্দিরা উঠিয়া গিয়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইল! কী বিশ্রী অবস্থাই হইয়াছে তাহার! ভারী বেনারসী কাপড়টা এখনও ছাড়া হয় নাই ; একে গরম তায় এত লোকের ভীড় তাহার উপর এই কাপড়, ফলে অনবরত ঘামিয়া তাহার সমস্ত দেহ যেন ফ্যাকাশে হইয়া চুপ্‌সাইয়া গিয়াছে। ভিতরের সাদা ব্লাউজটা তো ভিজিয়াছেই, উপরের সিল্কের জামাটা পর্য্যন্ত সপ্‌সপে হইয়া উঠিয়াছে। কপালের চন্দন চিহ্ন অধিকাংশই ধুইয়া গিয়াছে, অযত্নরচিত কবরী হইতে অনেকগুলি চুল, মাথায় কাপড় দেওয়ার অনভ্যাসজনিত টানাটানিতে নামিয়া আসিয়া কপালময় জড়াইয়া রহিয়াছে। তা ছাড়া আসিবার সময় ঠাকু'মা সিঁথিতে খানিকটা সিঁদুর লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারও অনেকখানি ঘামের সঙ্গে মিশিয়া তাহার শুভ্র কপালকে

আপনা-আপনিই রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। আগের দিনের রাত্রিজাগরণ ও দুশ্চিন্তার ফলে চোখের কোলে গভীর কালিমা—এক কথায়, তাহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে!

কিন্তু তবুও, কপালের উপর হইতে ভিজা চুলগুলি একটা আঙ্গুলে করিয়া সরাইতে সরাইতে ইন্দিরা ভাবিল, তাহাকে খুব খারাপ দেখাইতেছে না তো! বাপের বাড়ীতে চিরকাল সে শুনিয়া আসিয়াছে যে তাহার স্ত্রী-জনোচিত কমনীয়তার নাকি একান্ত অভাব, তাই তাহার রূপ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে পছন্দ করা কঠিন। 'গেছোমেয়ে' 'মদ্দাটে' 'ঘোড়ায়চড়া মেয়ে-মানুষ' এইসব তাহার চিরকালের আখ্যা। সুতরাং তাহার আশঙ্কা ছিল যে বধূবেশে হয়ত তাহাকে খুবই বেমানান দেখাইবে, কিন্তু হঠাৎ আজ সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আবিষ্কার করিল যে তাহাকে বধূ সাজিয়া অন্যান্য নব-অনুরাগিনী বধূদের মতই দেখাইতেছে—এবং সুন্দর দেখাইতেছে। কখন আর কী করিয়া ইহা যে সম্ভব হইল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না, শুধু আবেশ-মুগ্ধ-নেত্রে নিজের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার মনে পড়িল স্বামী ললিতের কথা। লোকটি শুভদৃষ্টির সময় কিছুতেই ভাল করিয়া মুখ তুলিতেছিল না, অথচ একবার চোখাচোখি হইবার পর হইতে কত বার কত ছলেই না তাহার দিকে চাহিতেছিল। বাসর ঘরে আত্মীয়াদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া কেবলই যে তাহার গোলমাল হইতেছিল, তাহার কারণটাও ইন্দিরা জানে, ললিতের মনটা ছিল নতমুখী নববধূর দিকেই। ইন্দিরা ইচ্ছা করিয়াই ললিতের দিকে অবগুণ্ঠনটা টানিয়া দিতেছিল আর তাহার জন্য বেচারার চোখে কী করুণ মিনতি।···ইন্দিরা আপন মনেই হাসিয়া উঠিল আর সঙ্গে সঙ্গে সুখে ও লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখে কে যেন খানিকটা আবির ছড়াইয়া দিল।

অকস্মাৎ আয়নায় আর একখানা মুখ তাহারই পাশে প্রতিফলিত হইল। এ তাহার দেবর, ললিতের ঠিক পরেই যে ভাই, অসিত, একবার দ্বারপ্রান্তে

দাঁড়াইয়া আয়নাতে ইন্দিরার সহিত চোখাচোখি হইতেই লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেল। ইন্দিরাও ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল। ছিঃ ছিঃ, না জানি অসিত কি ভাবিল।

একটু পরেই তাহার কানে গেল অসিত চাপা গলায় বলিতেছে, আচ্ছা কি তোমাদের আক্কেল মা! এতক্ষণ এসেছে একটা মানুষ, এখনও সেই বেনারসী জড়িয়ে বসে রয়েছে—কাপড়টাও ছাড়াতে পারোনি। মুখ হাত ধোওয়াবে, জল খাওয়াবে—এসব কথাও কি এখনও মনে করিয়ে দিতে হবে?

তাহার শাশুড়ী জবাব দিলেন, মনে করিয়ে দিতে হবে কেন বাছা, সব মনে আছে। কী করব, একলা মানুষ, যে দিকটিতে না যাবো সে দিকেই গোলযোগ বেধে বসে থাকবে! ওলো ও সরি, বিন্দী, তোদের কি একটু বিবেচনা নেই? এই খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুল্‌ছি, এর মধ্যে কি আমাকেই আবার গিয়ে বৌয়ের কাপড় ছাড়বার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে? তোরা কি একটা কাজও পারিস না? আর বড় বৌমাও তো রয়েছে, কাকে বলব বলো, সব হয়েছে সমান!

তিনি আরও কিছুক্ষণ বকিয়া চলিলেন। ইতিমধ্যে সরি-বিন্দী অর্থাৎ তাঁহার দুই যমজ কন্যা হৈ হৈ করিয়া উঠিল, এরি মধ্যে অমনি নতুন বোয়ের কথা টুকুস্ ক'রে কে লাগালে মায়ের কাছে ছোড়দা বুঝি? বাব্‌বা, বাড়ী না ঢুকতে ঢুকতেই এই।···বড় বৌদি এসেছিল তবু একটু ময়লা, তাই এখনও বাপের বাড়ীতে ঠাঁই হচ্ছে, এবার সুন্দরী বৌ এসেছে, দেখছি এখানকার মায়া কাটাতে হবে!

অসিত কী বলিল বোঝা গেল না! কিন্তু সরমা, বিনোদিনী ও বড়বৌ এবং তাহাদের সঙ্গে একপাল ছেলে মেয়ে, আবার আসিয়া পড়িল।

সরমা কহিল, চলগো বৌদি ও ঘরে, ঐখানেই কাপড়টাপড় ছাড়বে। কলঘরও ঐ পাশে, মুখহাত ধোও তো চলো।

বড়বৌ এখনও বধূ, সে ঘোমটার মধ্য হইতেই ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, বিন্দী ঠাকুরঝি, ওর তোরঙ্গটা দেখেছ, কী কাপড়চোপড় আছে?

বিন্দী ঘাড় নাড়িয়া চুপি চুপি জবাব দিল, দেখেছি ভাই। ঐ অম্‌নি খানকতক ক'রে সব রকম দিয়েছে। তোমার সঙ্গে যা কাপড় এসেছিল তার অর্দ্ধেকও নেই।

বড়বৌ তেম্‌নি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, তা হোক্ ভাই, তাতে তো দোষ হবে না, এবারে যে সুন্দর বৌ এসেছে—

ইন্দিরার ঘাড় আরও নীচু হইয়া গেল। সরমা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তাড়া লাগাইয়া কহিল, বিন্দী কী দাঁড়িয়ে আছিস্ সঙের মত, যা না, তোরঙ্গ খুলে একটা দিশী কাপড় বার ক'রে নিয়ে আয় না—

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিন্দী বলিল, যাচ্ছি, যাচ্ছি—বলি সাবান-টাবান চাই তো!

সরমা জবাব দিল, ওসব কিচ্ছু দরকার নেই, কলঘরে এইমাত্র আমার নতুন সাবান রেখে এসেছি। চলগো বৌদি—

সামান্য কিছু প্রসাধনের পর ইন্দিরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল। ইহার পর, একথালা খাবার আসিয়া পৌঁছিল। জল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি। যাহারা অনুরোধ করিতেছে তাহারা সকলেই বিবাহিতা—সবাই জানে যে এ অবস্থায় খাওয়া যায় না—তবু পীড়াপীড়ির অন্ত নাই।

যে ঘরটাতে ইন্দিরা বসিয়াছিল সেটা নাকি ললিতেরই ঘর, অর্থাৎ এখন হইতে তাহারও। ইহারই এক ফাঁকে ললিত একবার ব্যস্ত ভাবে ঢুকিল, অকারণে দেরাজটার দু-তিনটা টানা খুলিয়া কী নাড়াচড়া করিল, আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। বড়বৌ আর বিন্দী তখন চুপি চুপি আপোষে আলাপ করিতেছিল; কিন্তু সরমা মুখ টিপিয়া হাসিল, আর ইন্দিরা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কী লোকটার আক্কেল! বুদ্ধি বিবেচনা

যদি একটুও আছে, দেরাজ হইতে কিছু একটা বাহির করিয়া লইয়া গেলেও তো চলিত!

ইতিমধ্যে নীচে আরও বহুলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আত্মীয়া কুটুম্বিনীর দল একে একে আসিতেছেন। বিন্দী কহিল, মুঙ্গেরের পিসীমা এলেন বোধ হয়—ওলো সরি, শোন্, আমাদের মোহিনীদির গলা পাচ্ছি না? চল্—দেখে আসি—

ফলে সবাই নীচে নামিয়া গেল। ইন্দিরা আবারও একা, সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিছানাতে গা এলাইয়া দিল। সমস্ত শরীর তখন ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আর যেন বসিয়া থাকা যায় না! কিন্তু একটু পরেই লক্ষ্য করিল দ্বারপ্রান্তে অস্পষ্ট একটা ছায়া, কে যেন আড়াল হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। একটু ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল চৌদ্দ-পনোরোর একটি ছেলে, ললিতের সহিত মুখের এতই সাদৃশ্য যে চিনিতে ভুল হয় না—এ-ও তাহার একটি দেবর।

সহসা চোখাচোখি হইতেই দারুণ লজ্জা পাইয়া জিতু পলাইতেছিল কিন্তু ইন্দিরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চুপি চুপি ডাকিল, এসোনা ভাই ঠাকুরপো—

জিতু অপ্রতিভ-ভাবে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল। ইন্দিরা তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, অমন চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে, আমি বুঝি তোমার পর?

ইন্দিরার ঠিক পরের যে ভাইটি, তাহার এমনিই বয়স, তাহার কথাই ইন্দিরার মনে পড়িয়া গেল।

জিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, না তা নয়। ভাবলুম আপনার শরীর খারাপ, শুয়েছেন, মিছি মিছি ঘরে ঢুকলেই আবার হয়ত আপনি উঠে পড়বেন—

ইন্দিরা কহিল, তা হোক্।…তুমি ব'সো। কিন্তু তা ব'লে তুমি ভাই আমাকে 'আপনি' বলতে পারবে না, বড্ড যেন পর পর লাগে।

জিতু বলিল, তবে কী বলব ?

কুন, 'তুমি' বলবে। তোমার দাদাকে কি বলো ?

জিতু ঘাড় নীচু করিয়া কহিল, বা-রে ! একদিনেই কি বলা যায় !

এই সময়ে নীচে হইতে অসিতের গলা পাওয়া গেল, জিতু ! ওরে জিতু !

জিতু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ছোড়দা ডাকছে বৌদি আমি এখন আসি। বোধ হয় আবার কোথাও নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে।

ইন্দিরা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমিই বুঝি সব নেমন্তন্ন করছ ?

জিতু লজ্জা পাইয়া কহিল, না, তা নয়। ভট্‌চাজ্জি মশাই যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে থাক্‌তে হচ্ছে—

জিতু চলিয়া গেল। কিন্তু ইন্দিরার আর শোওয়া হইল না। কারণ সেই সময়েই ওপাশের বারান্দায় আবার কাহার পদশব্দ শোনা গেল। ইন্দিরা মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া ভাল করিয়া বসিতে না বসিতেই ঘরে ঢুকিল উনিশ কুড়ি বৎসরের একটি বিবাহিতা মেয়ে। মেয়েটির দিকে একবারমাত্র চাহিলেই নজরে পড়ে তাহার অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং বড় বড় চোখ। কিন্তু আর যেন কোথাও কোন শ্রী নাই, অত্যন্ত কঠিন ও পরুষ মুখের ভাব।

সে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, তুমিই বুঝি নতুন বৌ এলে ?

ইন্দিরা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মিনিট কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভাল। ললিতদা তোমাকে নিজে দেখেই এনেছে বোধ হয় ? পছন্দ হ'লেই ভাল।

আরও কিছুক্ষণ সে তেম্‌নি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ! ইন্দিরা তাহার এই কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল ; সে নীরবে বসিয়া ঘামিতে লাগিল, কী আলাপ করিবে ভাবিয়া পাইল না।

আরও একটু পরে সেই মেয়েটিই কহিল, শোন, মুখ তুলে চাও। ···আমি তোমার চেয়ে ফরসা না কালো ?

ইন্দিরা অস্পষ্টস্বরে কহিল, ফরসা।

তোমার চেয়ে ভালো দেখতে না খারাপ ? না, না, চুপ ক'রে থেকো না, জবাব দাও !

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। ইন্দিরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই মেয়েটির মধ্যে কোন শ্রী খুঁজিয়া পাইল না। তবু মুখে কহিল, অনেক ভালো।

হুঁ। তবু তোমাকে পছন্দ ক'রেই এনেছে।

সে আর দাঁড়াইল না। চোখের দৃষ্টিতে যেন এক ঝলক্ অগ্নিবৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহির হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকিলেন মুঙ্গেরের পিসিমার দল ! পিসিমা, তাঁহার মেয়ে মোহিনী, তাঁহার পুত্রবধূ —একদল। সঙ্গে সঙ্গে সরি-বিন্দীও।

ঘর ভরিয়া গেল। আবার সেই মুখ তুলিয়া দেখানো—লজ্জায় চোখ বুজিয়া আসা। পিসিমা পুত্রবধূর দিকে কী যেন একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বাঃ বেশ বউ হয়েছে আমাদের ললিতের, খাসা বৌ। ওর বরাতটাই ভালো। বলিয়া একজোড়া সোনার ঝুম্‌কা বাক্সসুদ্ধ হাতে গুঁজিয়া দিলেন। মোহিনী এতক্ষণ পিছন হইতে একদৃষ্টে দেখিতেছিল, এখন কোলের ছেলেটা নামাইয়া দিয়া কাছে আসিয়া সহসা পাশে বসিয়া পড়িল, তাহার পর দুই হাত দিয়া ইন্দিরাকে জড়াইয়া ধরিয়া দুইগালে দুইটা চুম্বন করিয়া কহিল, বেশ ভাই বৌদি, তোমাকে আমার বড্ড পছন্দ হচ্ছে। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম তো তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যেতুম, না হয় ললিতদা শেষ পর্য্যন্ত পুলিশে দিত !

সবাই হাসিয়া উঠিল। সরমা কহিল, আচ্ছা আমাদের মোহিনীদি নতুন বৌ পেয়ে যে গলে গেল একেবারে ! এখন আর আমাদের দিকে নজর নেই—আগেতো আমাদের নিয়েই পালাবে বল্‌তে !

মোহিনী একটা ভালো হাতীর দাঁতের সিঁদুর কৌটা বাহির করিয়া খানিকটা সিঁদুর লইয়া ইন্দিরার সিঁথিতে লাগাইয়া দিল, তাহার পর কৌটাটা হাতে দিয়া কহিল, এই কৌটো থেকেই সিঁদুর নেবে রোজ; আমার দেওয়া কৌটো, ওর পয় আলাদা। আমার শ্বাশুড়ী সধবা গেছে, দিদিশ্বাশুড়ী গেছে, তার শ্বাশুড়ীও গেছে—আমিও যাব, দেখবে!

সগর্ব্ব হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তাহার, সে একবার উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, সরি হাসছিস, দেখবি যাই কি-না!

ইতিমধ্যে বিন্দী কাছে আসিয়া ইন্দিরাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের আসবার আগে ঐ যে ছুঁড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ও কিছু বলছিল নাকি তোমাকে?

ইন্দিরা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিন্দী তখন নিজেই বলিল, কী আস্পদ্দা ছুঁড়ির, আর কি সাহস! জানো বৌদি, আমাদের মেজদাকে কী কম ফাঁদে ফেলেছিল ও! মেজদা দিন-কতক ওকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল একেবারে। ছেলে এই বিষ খায় তো এই বিষ খায়—কী কাণ্ড! তবে নাকি বাবা বড় শক্ত মানুষ, তাই কিছুতে ন্থইল না। শেষে বেগতিক দেখে ওর বাবা অন্য বিয়ে দিলে। ···সাংঘাতিক মেয়ে ও!

সহসা ইন্দিরার মনে হইল মনের মধ্যে অনেকগুলি আশার আলো একসঙ্গে নিভিয়া গেল। উৎসব বাড়ীর যে রেশ তাহার মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহারও সবকয়টি তার অকস্মাৎ যেন বেসুর বাজিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ মুখে একবার ঢোঁক গিলিল।

সরমা কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, কার কথা বলছিস লা বিন্দী?

বিন্দী কহিল, আমাদের হিমি আর কার কথা, দেখিস্নি, আমরা যখন আস্ছি হিমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গালে হাত দিয়া সরমা কহিল, ওমা তাই নাকি ? কী সাহস বাবা, কালামুখ এখানে বার করতে লজ্জা করে না ওর !

বিন্দী কহিল, হ্যাঁ, ওর আবার লজ্জা। লজ্জা হবে একেবারে ম'লে। মায়েরও যেমন, ওদের বাড়ী আবার গেল নেমন্তন্ন করতে।

সরমা কহিল, তা ও যে আবার এ ভিটেয় পা দেবে, তা মা কেমন ক'রে জানবে বল্।

এখনও কি মেজদার আশা ছাড়তে পারেনি ও ?…

সহসা ইন্দিরার বিবর্ণ মুখের দিকে চোখ পড়িতে মোহিনী কহিল বৌদির মুখটা অমন শুকিয়ে গেল কেন ভাই ? কোন অসুখ করছে কি ?

ইন্দিরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না !

কিন্তু মোহিনী শুনিল না, বলিল, তুমি 'না' বললে কি হবে ভাই, ও আমি জানি যে, আমারও তো বিয়ে হয়েছে, আর সে এমন বেশী দিনের কথা নয় যে ভুলে যাব।…একে উপোষ, তায় ঘুম নেই, তায় এই ধকল, শরীরের যা অবস্থা হয় তা আমি জানি তো !…ওরে তোরা চ' দেখি—আমরা নীচে যাই ভাই বৌদি, মামিমার সঙ্গে এখনও দেখাই হয়নি বলতে গেলে—তুমিও বরং একটু শুয়ে পড়ো। এই সরি চল্, বিন্দী ওঠ্—এখন আর বেচারীকে জ্বালাতন করিসনি।

মোহিনী একরকম জোর করিয়াই সবাইকে টানিয়া লইয়া গেল। খালি গেল না ছোটর দল। তিন চারটি ছেলে-মেয়ে তখনও তাহাকে ঘিরিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুতরাং ইন্দিরা শুইতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। যদিও তখন সত্যই তাহার মাথাটা রীতিমত ধরিয়া উঠিয়াছে—

বারান্দার দ্বারপথে কাহার যেন একটা ছায়া পড়িল। একটু পরেই অসিতের গলা পাওয়া গেল, এই বেবি শোন—

একটি বছর-আষ্টেকের মেয়ে সেই দলের মধ্য হইতেই সাড়া দিল, ছোটকা' ডাকছে ?

সে উঠিয়া গেল, একটু পরেই একখানা পাখা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে সাড়ম্বরে হাওয়া করিতে বসিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ইন্দিরা হাসিয়া তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইতে গেল কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না, বরং গম্ভীর মুখে কহিল, ছোটকা' ভারি বকাবকি করছে আমাকে, বলে তোরা অতগুলো লোক হাঁ ক'রে বসে রয়েছিস ওখানে, এ কথাটাও কি আবার ব'লে দিতে হবে, একটু বুদ্ধি নেই! সে হবে না কাকীমা, বাতাস আমি করবই—

অগত্যা ইন্দিরা চুপ করিয়া রহিল। হাওয়াটাতে বাস্তবিকই বড় আরাম বোধ হইতেছিল তাহার। সঙ্গে সঙ্গে অসিতের প্রতি কৃতজ্ঞতাতেও তাহার মন ভরিয়া গেল ; এখানে আসা পর্য্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটির যেটুকু পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছে যে বাড়ীর মধ্যে এই লোকটিরই বুদ্ধি বিবেচনা সকলের চেয়ে বেশী।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। যত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা লইয়া সে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল—তাহার বিকশিত কুমারী-জীবনের যত কিছু স্বপ্ন—সমস্তরই আনন্দমঞ্জরীগুলি কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সেই গৌরাঙ্গী মেয়েটির উষ্ণ নিঃশ্বাসে যেন পুড়িয়া ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে, আর তাহারই অসহবেদনা তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতেছে। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে, পান্তুয়া-ভাজা শুরু হইয়াছে এই সংবাদ পৌঁছিতে ছেলের দল সরিয়া পড়িয়াছে—ইন্দিরা তখন একা। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল! তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, তাহারই চমৎকার স্নিগ্ধ ঝির-ঝির হাওয়ায় তাহার মাথা যেন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। সে একটা লোহার থামে মাথা রাখিয়া চক্ষু

বুঝিল। উৎসব বাড়ীর কোলাহল সেখানেও কানে আসিতেছিল; বাগান হইতে ভাসিয়া আসা মিশ্র ফুলের গন্ধ মিষ্টানের গন্ধের সহিত মিলিয়া বার বার তাহাকে স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, এই আনন্দ উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, ইহার নায়িকা সে-ই—কিন্তু কিছুতেই তাহার মনে কোন উৎসাহ জাগিল না। সামান্য একটুখানি ইতিহাস এই সব-কিছুই তাহার কাছে অর্থহীন করিয়া দিয়াছে, মনে হইতেছে ইহার কোনও অর্থ ই কোন দিন সে খুঁজিয়া পাইবে না।···

বহুক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে-যে কোন একটা বিশেষ কথা ভাবিতেছিল তাহা নয়, তবু কখন যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে শুরু হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এমন কি কখন যে ললিত নিঃশব্দে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে টের পায় নাই। সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল ললিতের স্পর্শে। সে আস্তে আস্তে ইন্দিরার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া চুপি চুপি কহিল, তুমি এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে কেন ইন্দু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে—ও কি, কাঁদছ তুমি?···

ইন্দিরা চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল। কিন্তু চোখের জল তাহার, বোধ করি ললিতের স্পর্শে-ই, আরো বিদ্রোহ হইয়া উঠিল, সে কিছুতেই কান্না চাপিতে পারিল না।

ললিত অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর সহিত পরিচয় তাহার বেশীক্ষণের নহে, এমন কি পরিচয় নাই বলিলেও চলে, এক্ষেত্রে কী বলা কিম্বা কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত তাহা সে ভাবিয়া পাইল না অসহায়-ভাবে খানিকটা এদিক-ওদিক চাহিয়া ইন্দিরার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল, কেঁদোনা লক্ষ্মীটি। আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, ছি!···তোমার কি মায়ের জন্যে মন কেমন

করছে? এইত পাঁচ-ছটা দিন পরে আবার সেখানে যাবে। ভয় কি?... এখানে কি কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

ইন্দিরা নীরবে ঘাড় নাড়িল। তাহার পর বার বার মুছিয়া চোখের জলটাকে কতকটা সংযত করিয়া লইল, এবং ললিতের হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। ললিতও পিছু পিছু ঘরের মধ্যে ঢুকিল কিন্তু আর কাছে গেল না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া আপনমনেই কহিল, এরাই বা গেল কোথায় ছাই, কী সব আক্কেল জানিনা! বেচারীকে একলা রেখে— আচ্ছা দেখছি আমি, সরিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

ইন্দিরা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, না আমি বেশ আছি। কাউকে ডাকবেন না—

আবারও দুজনে নীরব।

খানিকটা পরে ললিত আস্তে আস্তে গিয়া চৌকীটারই একপাশে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকে এ কিসের চঞ্চলতা, সে কিছুতেই ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেছে না কেন?...ইন্দিরারও মনে হইতেছিল যেন দম বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহার বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে—

ললিত চুপি চুপি কহিল, তোমাকে পেয়ে একটু আগে আমার নিজেকে কী সৌভাগ্যবানই যে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখন তোমার দিকটা ভাবিনি, তোমাকে পেলুম এই আনন্দেই মাতাল হয়ে ছিলুম। তুমি যে তেম্নি আমাকে পাওয়া দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করতে পারো একথাটা তখন মনে পড়েনি। সত্যিই তো, কীই বা আমার যোগ্যতা।

কে জানে কেন, ললিতের গলার স্বরে ইন্দিরার কণ্ঠ উপ্‌চাইয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। সে কোন মতেই অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ললিত আবার কী বলিতে যাইতেছিল কিন্তু নীচে হইতে তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল। তিনি কাহাকে যেন চুপি চুপি বলিতেছেন, ছুঁইও

যেমন, বৌ একলা আছে ব'লে ভুর্ভাবনায় তো তোর ঘুম হচ্ছিল না !···ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, তা ভুলে যাস্ কেন ?···ভাবলুম, যে সে এসে অবধি তো আমি একটি মিনিট অবসর পাইনি, যেতেও পারিনি, এখন একটু গিয়ে নতুন বোয়ের কাছে বসি ; ওমা, গিয়ে দেখি ছেলে-বৌ আমার দিব্বি বারান্দায় হাত ধরাধরি ক'রে গল্প করছে, যেন কতকালের পরিচয়। আমি লজ্জা পেয়ে পালিয়ে এলুম !

ইন্দিরা জিভ কাটিয়া ঘাড়টা আরও নীচু করিল, ললিতও আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না, বিষম লজ্জিত হইয়া ওপাশের বারান্দা দিয়াই পলায়ন করিল।

নীচ হইতে শরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ওমা তাই নাকি ! অবাক করেছে বাবা ! আমরাও তো আজকালকার মেয়ে, কিন্তু এমন বেহায়া—

কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, মোহিনীদিই বোধ হয়—বলিল, তুই থাম সরি। সবাইকেই চিনি, ষাঁড়ের মত গলা বার ক'রে অত জাহির করতে হবে না। তুই তো বাসরঘর থেকেই বরের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করতে শুরু করেছিলি—

একটু পরেই মোহিনী উপরে আসিল। কোলের ছেলেটাকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বিছানার উপরেই বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ওমা, তুমি তো একলাই রয়েছ, তবে যে ওরা—

তাহার পরই কথাটা চাপিয়া গিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দিরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, তোমার চোখ অত লাল কেন ভাই, যেন মনে হচ্ছে কাঁদছিলে—

ইন্দিরা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মোহিনী ছাড়িবার মেয়ে নয়, সে ডানহাতে তাহার চিবুকটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, উঁহু, তুমি না বললেই আমি শুনব কেন ? এযে দিব্যি কান্নার চিহ্ন দেখছি। ব্যাপার কি বলোত, বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে ?

ইন্দিরা কথাটা চাপা দিবার জন্য সায় দিল। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী

মেয়েটিকে তবু ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না ভাই, আমায় অত সহজে ঠকাতে পারবে না। আমি তখনই দেখে গেছি, হঠাৎ তোমার কি হ'ল। ওহো...সরি-বিন্দির কথাটা তোমার কানে গেছে, না? আ আমার কপাল!...নিশ্চয়ই তাই।

ইন্দিরা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

মোহিনী কাছে আসিয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কহিল, ওরে পাগলী,...বৌদিই হও আর যা-ই হও, বয়েসে আমার ছোট....পাগ্‌লীই বলব, ওসব কথা নিয়ে কি দুঃখু পেতে আছে! তখন সবে ওর উঠ্‌তি বয়স আর মেয়েটাও ভারী পাজী। ওকে জড়াতে চেয়েছিল। তখন ঝোঁকের মাথায় কী বলেছিল সেই কথা কি আজও ধরে বসে থাকে কেউ? তা ছাড়া পুরুষমানুষ, বিয়ের আগে অমন অনেক নেশা লাগে, তখন তো আর তুমি আসনি ভাই, এমন ভাগ্যি যে হবে তা ও জানতও না।...নাও নাও, ওসব তুচ্ছ কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। একটু মাথা তুলে চাও দেখি আমার দিকে, মুখ তোল...হুঁ, এমন রূপ যার, সে আবার ঐসব ভেবে মন খারাপ করে!—ওলো বৌদি, আমারই যে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তোমার দিকে চেয়ে, মেজদা তো তুচ্ছ। চিরকাল মাথা মুড়িয়ে এই পায়ে দাসখৎ লিখে বসে থাকবে দেখ্‌বি—

ইন্দিরা তাহার ভাবভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিল। তখন তাহার চোখের পাতা ভিজা, তাহারই মধ্যে এই হাসিটি শরতের আকাশের মতই ভারী মধুর লাগে। মোহিনী তাহাকে একটা চুম্বন করিয়া কহিল, চল্ ভাই বৌদি আমরা নীচে যাই, ওদের কাছে গিয়েই বসিগে—

ইন্দিরা উঠিয়া মোহিনীর ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তখন তাহার মন হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের বেদনার যেন চিহ্নমাত্রও নাই। আবার উৎসববাড়ীর নেশা লাগিয়াছে তাহার মনে।

মোহিনীর পিছনে পিছনে লজ্জিত নত মুখে সে নীচে নামিয়া গেল।

কন্‌ষ্টেবল্‌

গঙ্গারামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গর্ব্ব ছিল এই যে তাহার মত হুঁশিয়ার কন্‌স্টেবল্‌ সারা শহরে একজনও নাই। সব-ইন্‌স্পেক্টর জিতেনবাবু প্রায়ই বলিতেন, 'এতদিন চাক্‌রী কর্‌ছি, গঙ্গারামের মত হুঁশিয়ার জমাদার আর একজনও দেখ্‌লুম না।' চাকুরীও জিতেন বাবু বড় কম দিন করিতেছেন না; আগামী অগ্রহায়ণে দুই বৎসর পূর্ণ হইবে।

গঙ্গারাম কিন্তু বহুদিন কাজ করিতেছে। প্রায় সাত বৎসর হইবে। ইহারই মধ্যে হুঁশিয়ারী ও কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার পদ-বৃদ্ধিও হইয়াছে। গঙ্গারাম এই দীর্ঘ সাত বৎসর সময়ের মধ্যে একবার মাত্র ঘরে গিয়াছিল। কারণ সংসার বড়, জমি-জমা তাহার পিতার দোষে প্রায় সবই গিয়াছিল পিতা নিজেও গিয়াছেন; কাজেই সংসারের সব দায়িত্ব এখন তাহার উপর—খরচেও কুলায় না। টাকা সে যত উপার্জ্জন করে সবই দেশে পাঠাইতে হয়। সুদূর গোরখপুর জেলার কুশল-ভাগবত গ্রাম—যাওয়া আসায় অন্ততঃ আঠারটি টাকা খরচ। সুতরাং একেবারের বেশী আর যাওয়া হয় নাই।

গঙ্গারাম আঠারো বৎসর বয়সে পঞ্চমী রামপিয়ারীকে বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের চার বৎসর পরেই চাকুরী করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসে। তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর পত্নীর দ্বিরাগমন উৎসব উপলক্ষে পনেরো টাকা ধার করিয়া গঙ্গারাম দেশে গিয়াছিল। সেই ধার শোধ করিতেই তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। সেইজন্য আর যাওয়ার কথা মুখে আনিতে পারে নাই।

কিন্তু রামপিয়ারীর এখন ষোল বৎসর বয়স। কথাটা মনে করিতেও গঙ্গারামের বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া ওঠে! রামপিয়ারী সুন্দরী ইহা সে দ্বিরাগমনের সময়েই লক্ষ্য করিয়াছিল। সুন্দরী ষোড়শী বধূর বিরহ-কাতর

মুখ কল্পনা করিতেই নিজের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ নিঃশ্বাস একটা বাহির হইয়া আসে। সম্প্রতি গঙ্গারামের মনে সুখ নাই।

যে হুঁসিয়ারীর জন্য সে বিখ্যাত, সেই হুঁসিয়ারীও যেন তাহার ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে বসিযাছে। 'বিটে' পাহারা দিতে দিতে মন তাহার কলিকাতা শহর ফেলিয়া চলিয়া যায় গোরখপুর জেলায়। স্ত্রীর মুখ সে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে। যত রকমের অপরূপ মুখ সে কল্পনায় আনিতে পারে, আর 'বিটে' পাহারা দিতে দিতে যত রকমের সুন্দর চেহারা চোখে পড়ে, কোনটাই যেন রামপিয়ারীর সহিত মেলে না। ঠিক অত সুন্দর হয়ত নয়, কিন্তু খুবই সুন্দর!

ষোল বৎসরে মেয়েদের চেহারা যতটা পুষ্ট হয় রামপিয়ারী বোধ হয় তাহার অপেক্ষা কিছু কৃশ। কারণ বিরহ। রামপিয়ারীর স্বামী ঘরে নাই—মনেও সুখ নাই নিশ্চয়ই। ভাল করিয়া খায়ও না হয়ত। গঙ্গারামের বুক চিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ওঠে।

সম্প্রতি পাড়ার দীনশরণ মিশিরকে দিয়া মা চিঠি লিখাইয়াছেন, কিছুদিন যাবৎ নাকি রামপিয়ারীর শরীব মোটেই ভাল যাইতেছে না! গঙ্গারামের একবার আসা দরকার। মধ্যে মধ্যে উহার জ্বরও হইতেছে। ইত্যাদি—

রামপিয়ারী স্বামীকে কতটা ভালবাসে কে জানে। গঙ্গারামেরও শরীর মোটে ভাল হইতেছে না। প্রত্যহ সে পঞ্চাশটি ডন্‌ দিয়া আধ সের ছোলা খায়, তথাপি চেহারার তাদৃশ উন্নতি নাই। অবশ্য জ্বর হয় নাই বটে কিন্তু তাহা হইলে চাকুরী থাকিবে না। তবুও মনে হয় যেন সে রামপিয়ারীকে যতটা ভালবাসে তাহার অপেক্ষা রামপিয়ারীই বেশী……

মায়ের যেমন কাণ্ড, ডাক্তারও হয়ত একবার দেখানো হয় নাই। শরীর গরম হইলে জ্বর হওয়া বিচিত্র নয়। একটু ঘোল কিম্বা কাঁচা দুধের সরবৎ খাওয়াইলে অনেক সময় ফল পাওয়া যায়। গঙ্গারামের হুট্‌ করিয়া দেশে তো গেলেই চলে না। অন্ততঃ বিশটি টাকা দরকার। জমাদার লুণ্ঠন

তেওয়ারী কুড়ি টাকা হয়ত ধার দিতে পারে, কিন্তু চার পয়সা করিয়া সুদ চাহিবে। মাসে পাঁচসিকা করিয়া সুদ, ভাবিলেও গা শিহরিয়া ওঠে—

গঙ্গারাম আকাশ পাতাল ভাবে; তবু উপায় স্থির হয় না। মনের আকুলতা বাড়ে খালি।

আগের দিন রাত্রে গঙ্গারাম রামপিয়ারীকে স্বপ্ন দেখিয়াছে, অত্যন্ত কৃশ; কিছুই খায় না, শুধুই কাঁদে। গঙ্গারাম গিয়াছে, কিন্তু তাহাকেও যেন সে চিনিতে পারে না—

মনটা তাহার সমস্ত দিনই খারাপ হইয়া রহিয়াছে।

জিতেনবাবু কহিলেন, টালিগঞ্জের দিকে গত তিন রাত্রি উপরি উপরি চুরি হয়ে গেছে। একজনের বাড়ী থেকে ঘটি গেলাস থালা কতকগুলো, আর একজনের বাড়ী থেকে একখানা কাপড় শুধু, আরও একজনের বাড়ী থেকে একটা গাড়ু ছাড়া কিছু নিতে পারে নি! কোনও দাগী আসামীকেও সন্দেহ হচ্ছে না ঠিক। বোধ হয় নতুন লোক হবে। তিনটে বাড়ী খুব কাছাকাছি···ওখানকার থানাও অবশ্য চেষ্টা করছে খুব। ইন্‌স্পেক্টরবাবু এই মাত্র আমায় বল্‌ছিলেন যে ঐ বিট্‌টা রাত্রে সুপারভাইজ করার জন্য একজন হুঁশিয়ার জমাদার দিতে পারি কিনা। আমি তোমার নাম করেছি। তুমি যেতে পারবে তো?

গঙ্গারাম সেলাম করিয়া কহিল, হুজুরের হুকুম হ'লেই যাব।

—বেশ, আজ রাত্রি দশটা থেকে বিট্ শুরু ক'রবে।···তার আগে ইন্‌স্পেক্টর বোসের সঙ্গে দেখা ক'রো। তিনি তোমায় কাজ বুঝিয়ে দেবেন।

গঙ্গারাম আহারাদি সারিয়া গুটি গুটি টালিগঞ্জের দিকে রওনা হইল। সেদিন রাত্রে তাহাকে অন্য চিন্তা ছাড়িতে হইবে। তাহার হুঁশিয়ারীর খ্যাতিতে দেশ বিদেশ হইতে ডাক পড়ে, সুতরাং মনোযোগ দিয়া কাজ

করিতেই হইবে, না হইলে এই বিপুল খ্যাতি নষ্ট হইয়া যাইবে। মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া সে রামপিয়ারীকে মনে না করিবার জন্য অসম্ভব উপায় কল্পনা করিতে লাগিল।

দশ সালে একজন কন্‌স্টেবল্ কৌশল করিয়া এগারো জন ডাকাত ধরিয়াছিল; ফলে সরকার বাহাদুর উহাকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। গঙ্গারাম যদি ঐ রকম একটা কিছু করিতে পারে তো মন্দ হয় না। একশত টাকায় উহার প্রয়োজন নাই, কুড়িটি টাকা হইলেই রামপিয়ারীকে—

সীতারাম! সীতারাম! আবার ঐ নামটা মনে আসিয়া যায়!

বিড়িগুলায় আজকাল আর নেশা জমে না।···একটা গাড়োয়ান পাইলে একটু খৈনির যোগাড় দেখা যাইত···শালা চোরদের স্পর্দ্ধা যেন বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। আচ্ছা, উহারা কি অস্ত্র লইয়া বাহির হয়?···মনে যেন একটু ভয়ের মত দেখা দিল, মনে পড়িল রামপিয়ারীর প্রথম যৌবন···।

আবার ঐ নাম মনে আসে! নাঃ—শালারা বিড়িতে ধুলা না কি পুরিয়াছে, নেশা মোটেই জমে না।

গঙ্গারাম জোরে জোরে পায়চারী শুরু করিল।

সহসা এক সময়ে মোড় ঘুরিতেই গঙ্গারামের চোখে পড়িল, শ্বেত বস্ত্রাবৃত কে একজন একটা বাড়ীর পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া গঙ্গারাম লাফাইয়া পড়িল।

একটা স্ত্রীলোক কাপড়ের আড়ালে একটা ছোট ঘড়া লুকাইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল। গঙ্গারাম বজ্রমুষ্টিতে উহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, চোট্টা···!

আর কোনও কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। দেশ দিন দিন কি হইতেছে? রাত্রি মোটে এগারোটা, বাড়ীর লোকজন জাগিয়া আছে

এখনও, গঙ্গারামের মত হুঁশিয়ার জমাদার পাহারা দিতেছে—উঃ! স্পর্দ্ধাও তো কম নয়!

রাস্তার আলোক মেয়েটির মুখে আসিয়া পড়িল। আরে, এ যে ছেলে মানুষ! বড়জোর ষোল-সতের বৎসর বয়স হইবে। এই বয়সেই—?

মেয়েটি অকস্মাৎ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া গঙ্গারামের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, কহিল, স্বামীর বড় অসুখ বাবা, খাওয়াতে পাচ্ছি না, চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মরছে, সইতে পারিনি ব'লেই···। আজকে আমায় ছেড়ে দাও, নইলে সে মরে যাবে। ওর অসুখ ভাল হোক্, আমি জেল খেটে দিয়ে আস্‌ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গারামের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, জিলা গোরখপুরে কুশল-ভাগবত গ্রামের এক ষোড়শীর রোগ-পাণ্ডুর কৃশ মুখ। গঙ্গারামের অসুখ করিলে, স্বামীকে ঐ অসহায় অবস্থায় দেখিয়া সে-ই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিত? হয় তো সে-ও···!

গঙ্গারামের জীবনে যাহা কখনও হয় নাই তাই ঘটিয়া গেল। কখন সে তাহার বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই, চৈতন্য যখন হইল মেয়েটি তখন কাছে নাই।

পরদিন থানায় আসিয়া সে তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করিল, তারপর লুঠন তেওয়ারীর কাছে চার পয়সা সুদে কুড়ি টাকা ঋণ।

কথায় কথায় কহিল, লুঠন, ভর দুনিয়ামে সব্‌সে বড়া উল্লু কভি দেখা হ্যায়।

লুঠন স্বীকার করিল যে, সে তাহা এখনও দেখে নাই।

গঙ্গারাম বুকে একটা আঙ্গুল রাখিয়া কহিল,—অব্ দেখো···।

অমাবস্যার রাত

যে ট্রেন দু'টো পঞ্চাশে পৌঁছিবার কথা, সে ট্রেন পৌঁছিল প্রায় পাঁচটায়। তারপর মেঠো পথ দিয়া প্রায় ক্রোশখানেক হাঁটিয়া স্কুলে পৌঁছিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আমাকে যে আবার সেইদিনই ফিরিতে হইবে! হেড-মাস্টার মহাশয় বলিলেন—ট্রেনের সময় হয়ে এল—এখন হেঁটে গিয়ে কি গাড়ী ধ'রতে পারবেন? তার চেয়ে বরং বোর্ডিং-এই আজকের রাতটা কাটান, কাল ভোরের ট্রেনে ফিরে যাবেন এখন।

হিসাব করিয়া দেখিলাম যে কাল ভোরের ট্রেনে ফিরিয়া গেলে কালকের দিনটিই মাটি হয়। অথচ এ অবস্থায় আর ঘোরাও যায় না। একবস্ত্রে বাহির হইয়াছি—কোথায় স্নান করি, কোথায় কাপড় পাই, সে এক সমস্যা হইবে; কাপড-জামা তো সবই জিয়াগঞ্জের ডাকবাংলোয় পড়িয়া আছে।

বিনীতভাবে কহিলাম—না, আমায় আজ ফিরতে হবেই, নইলে বড় ক্ষতি হবে! বুঝতে পারছেন তো, এই ক-টা দিন মোটে সময়, এরই মধ্যে আমায় সব জেলাটা সারতে হবে। আমি ঠিক গাড়ী ধ'রে নেব।

তবুও তিনি সংশয়ের স্বরে কহিলেন—পাবেন কি? সঙ্গে আবার ব্যাগটা রয়েছে—বরং আমাদের হোটেলের চাকর কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসুক। আলো আছে তো?

পকেট হইতে টর্চ্চটি বাহির করিয়া কহিলাম—এটা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকে। চাকর যাবারও বিশেষ দরকার নেই, তবে বলছেন যখন—

তিনি কহিলেন—না না, যাক। সমস্ত পথটা ব্যাগ ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'লে ট্রেন আর পাবেন না।

তাঁহাকে মুখে এবং মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাকরটি আমার ব্যাগ লইয়া আগে আগে চলিল, আমি

আলো হাতে পিছনে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, তখনও পুরা আধঘণ্টা সময় আছে, 'আধঘণ্টায় আর দুইমাইল রাস্তা যাইতে পারিব না? খুব পারিব!

কিন্তু একটুখানি চলিয়াই বুঝিলাম যে আসিবার সময় যতটা সময় লাগিয়াছিল, যাইবার সময়ও তাহার চেয়ে কম সময় লাগিবার বিশেষ কোনও সম্ভাবনা নাই। হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রবীণ হেডমাস্টার মহাশয়ের কথাটা শুনিলেই হইত। ডিস্‌ট্রিক্টবোর্ড কাঁচা রাস্তাটাকে সম্প্রতি মাটি চাপাইয়া উঁচু করিয়াছে। এঁটেলমাটির ছোট বড় ডেলাগুলি পাথরের মতই কঠিন, তাহাদের উপর কিছুতেই ঠিক করিয়া পা ফেলা যায় না—জোরে চলিব কি করিয়া? তাহার উপর আরও বিপদ হইল যখন সাঁকোটা পার হইয়া, অর্থাৎ ঠিক অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়া চাকরটি বলিল—তাহ'লে বাবু যাই আমি, আমার বিস্তর কাজ আছে!

পরের চাকর, বিশেষতঃ হোস্টেলের, এক্ষেত্রে তাহাকে আর অধিকদূর লইয়া যাওয়া অভদ্রতা; সুতরাং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে একটি দু'আনি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া ব্যাগটা নিজেই তুলিয়া লইলাম। তাহার পর একহাতে টর্চ্চ ও অপর হাতে ভারী ব্যাগটা লইয়া যতটা সম্ভব দ্রুত সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাতে শীতের রাতে ঘামিয়া উঠিলেও গাড়ী ধরিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

রাস্তা অজ্ঞাত এবং নির্জ্জন, কতটা আসিলাম এবং কতটা বাকী রহিল, একথা বুঝিবার বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। দু'ধারে ধূ-ধূ করিতেছে মাঠ, কখনও বা পাতলা রকমের বনও পাইলাম, কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, নিকটে কোথাও লোকালয়ের চিহ্নটি পর্য্যন্ত নাই। তখন আমার ট্রেন ছাড়া অন্য কোনও কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না, নচেৎ গা ছম্ ছম্ করিবার কথা।

কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্টেশনের বাহিরে

খাবারের দোকানগুলির কাছাকাছি পৌঁছিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল, অর্থাৎ একূল এবং ওকূল দুই-ই আমার গেল।

ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে ধূলি-ধূসর অবস্থায় হাঁপাইতে দাঁপাইতে স্টেশন-ঘরে যখন ঢুকিলাম, তখন ছোটবাবু ট্রেন পাশ করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বড় হিসাবের খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। স্টেশনের চাকরেরা বোধ হয় বাবুদের বাসার কাজে গিয়াছে। স্টেশন-ঘরে আর একটিমাত্র বৃদ্ধ ভদ্রলোক একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছেন। স্টেশনের ভিতরে বা বাহিরে আর কোনও লোক নাই।

ঘরে ঢুকিয়া অনাবশ্যক প্রশ্নই করিলাম—মাস্টারমশায়, এটা কি আজিমগঞ্জের ট্রেন বেরিয়ে গেল?

তিনি ঘাড় তুলিয়া মিনিটখানেক আমার সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাশয়ের নিবাস?

নিবাস এবং আগমনের কারণ সবই বলিলাম, কারণ এইপ্রকার দুটি তিনটি কৈফিয়ৎ না দিয়া এদেশের লোকের কাছে কোনও প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। পরে যতটা সম্ভব করুণভাবে নিজের দুরবস্থার কথা তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম।

ছোটবাবু বিশেষ দুঃখিতই হইলেন, কহিলেন—তাই তো! এর পরের গাড়ী যে সেই কালকে সকালে। সারারাত থাকবেন কোথায়? ওয়েটিংরুমের তো কোন বালাই নেই; স্টেশনরুমেরও আজকাল বড় কড়াকড়ি নিয়ম করেছে, কাউকে থাকতে দেওয়া নিষেধ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম—প্ল্যাটফর্ম্মেই সারারাত বসে কাটাতে হবে; কী আর ক'রব!

তিনি প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—র‍্যামোঃ, সে কি একটা কথা হ'ল! এই শীতে সারারাত প্লাটফর্ম্মে ব'সে থাকবেন?···ব্যবস্থা একটা ক'রে দিতে হবে বৈকি—

তারপর সহসা সেই বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—ঘোষালমশায় একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না ? বিদেশী লোক এসে এ-গ্রামে সারারাত অভুক্ত নিরাশ্রয় হ'য়ে থাকবেন ?

লোকটি যেন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন, সহসা জাগ্রত হইয়া বলিলেন—উনি যদি দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেন তাহ'লে আমি কৃতার্থ হবো। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন—বড দরিদ্র, ভরসা ক'রে অতিথি-সজ্জনকে বাড়ীতে ডাকতে পারিনে, নীরবে দাঁড়িয়ে ঘোষাল-বংশের অপমান দেখতে হয়।···কর্ত্তারা বলতেন—চিলগাঁয়ে কোনও লোক যদি অভুক্ত কিম্বা নিরাশ্রয় থাকে, তাহ'লে পূর্ব্বপুরুষদের অধোগতি হবে যে ! প্রথম যখন ইষ্টিশান হয় তখনও ঠাকুর বেঁচে ; কিছু নেই, নিজেরাই শেষ দশায় এসে ঠেকেছি, কিন্তু তবুও তিনি একজন ক'রে পাইক বসিয়ে রাখতেন ইষ্টিশানে, যদি কেউ বিদেশী আসে তো তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। বলতেন, ঘটী বাটিগুলো তো এখনও আছে ? সেগুলো থাকতে, যাঁরা ও-সব ক'রে রেখে গেছেন, তাঁদের তো অসম্মান করতে পারিনা।

ছোটবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—ঐ জন্যেই তো আজ এই অবস্থা। শাস্ত্রেই আছে ধরুন না, অতিদানে বলির্ব্বদ্ধ ! যাক—এখন তাহ'লে ভদ্রলোককে নিয়ে যান।

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—আপনি ঘোষালমশায়ের সঙ্গে যান। এঁরাই এ গাঁয়ের রাজা ছিলেন, আজও প্রজারা পুরোনো জমিদারকেই রাজামশাই ব'লে ডাকে, এঁদের বাড়ী 'রাজবাড়ী' ব'লেই সকলে চেনে।

আশ্রয় তখন আমার বিশেষ দরকার, ঘুমে সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আর প্রতিবাদমাত্র না করিয়া ব্যাগটা তুলিয়া লইলাম এবং টর্চ্চটা জ্বালিয়া পুনরায় রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। ঘোষালমহাশয়ও

পোড়া বিড়িটার আগুনে আর একটা বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে আমার আগে আগে চলিলেন। সোজা যে রাস্তাটা ধরিয়া এতক্ষণ আসিলাম, এবার আর সে রাস্তা নহে; বিরাট একটা আম-বাগানকে ডান পাশে ফেলিয়া সরু একটা কাঁচা পথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া যাইতে হইবে।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে চলিবার পর ঘোষালমহাশয় সহসা বলিলেন—আপনার সেবার কিছু বিলম্ব হবে কিন্তু।

সংবাদটায় ঠিক পুলকিত হইলাম না, তবুও সৌজন্যের খাতিরে কহিলাম—বেশ তো, তাতে আর কি হয়েছে?

তিনি কহিলে—প্রতি অমাবস্যাতে বাড়ীতে শ্যামা পূজা হয় কি-না! আগে ঠাকুর ক'রতেন, এখন আমি করি—তবে মহানিশা-পূজা হ'তে রাত ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ না হ'লে প্রসাদের ব্যবস্থা করা কঠিন।

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল সেদিন শনিবার! একে অমাবস্যা তায় শনিবার, তায় নির্জ্জন পল্লীগ্রাম! ব্যাপারটা মনে হইতেই গা-টা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। এ শিহরণ আমাদের রক্তের সহিত জড়ানো আছে। দেবতার মঙ্গলেচ্ছাকে আমরা হয়ত বিশ্বাস করি না, কিন্তু অপ-দেবতার অমঙ্গলেচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের আজন্ম সংস্কার!

অন্ধকারের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড জলা দেখাইয়া ঘোষালমহাশয় কহিলেন—ঐ হ'ল ঘোষালদীঘি; আমার প্রপিতামহের পিতা জয়নারায়ণ ঐ দীঘি কাটিয়েছিলেন। তাঁদের আমলে ঐ দীঘিতেই দুষ্টু বজ্জাত প্রজাদের ডুবিয়ে মারা হ'ত। এখনও খুঁজলে ওর পাঁকের মধ্যে থেকে অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে।—

তারপর একটা বড়রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—সে সব কথা এখন স্বপ্ন ব'লেই মনে হয়। এখন ঐ দীঘির মাঝখানে বোধ হয় দু-মানুষভোর জলও আর নেই, পাঁক আর শ্যাওলায় বোঝাই।

আমার কিন্তু ততক্ষণে বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিয়াছে। একবার মনে হইলে যে, এখনও সময় আছে, এই সুপ্রাচীন ঘোষাল-বংশের সংসর্গ এড়াইয়া পলায়নের ব্যবস্থা দেখি, কিন্তু কেমন চক্ষুলজ্জায় বাধিল, পারিলাম না। এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই পিছু পিছু চলিয়া প্রকাণ্ড একটা ভাঙ্গা বাড়ীর সামনে পৌছিলাম।

এককালে বোধহয় ইহা সাত-আট মহল বাড়ীই ছিল; তাহা ছাড়া অতিথিশালা, ঘোড়াশালা, হাতীশালা, পাইক মহল, নহবতখানা, দেউড়ী, সমস্তই ছিল, কিন্তু এখন আর সে সব পৃথক ভাবে কিছু খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। বিরাট ফটকটির একদিকের থাম একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে কিন্তু আর একদিকের থাম এখনও কোন রকমে মাথা তুলিয়া ঘোষাল-বংশের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। যাহাই হউক, সেই ফটক পার হইয়া যে ইষ্টকস্তূপ ও তাহার উপরে আগাছার জঙ্গল শুরু হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া কি করিয়া অন্তঃপুরে পৌছিব, এবং সম্মুখের অন্ধকারময় বিরাট ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে কোনও অন্তঃপুর কোথাও আছে কি না, না স্টেশনের ছোটবাবু নিরীহ বিদেশীকে এক উন্মাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া মর্ম্মান্তিক পরিহাস করিলেন, এই সমস্ত ভাবিয়া সেই শীতের রাতেও ঘামিয়া উঠিলাম!

ঘোষালমহাশয় বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, আর একটি বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে কহিলেন—কিছু ভয় নাই আপনার, সোজা চলে আসুন। এখন শীতকাল, সাপ-খোপ বিশেষ বেরোয় না। তা ছাড়া ঘোষালবাড়ীর মধ্যে কাউকে সাপে খেয়েছে একথা আমরা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি!

কি আর করিব! ইষ্টদেবতার নাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে টর্চ্চের আলোতে সেই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ দেখিয়া দেখিয়া পা ফেলিতে লাগিলাম। তাই কি পথেরই শেষ আছে! কত ইষ্টকস্তূপ যে পার

হইলাম, কত রকমের কত মহলের কথা ঘোষালমহাশয় বলিয়া চলিলেন তাহা আজ আর ঠিক স্মরণ নাই; সত্য কথা বলিতে কি, তখন মনোযোগও দিই নাই। কিন্তু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম শুধু এই কথা ভাবিয়া যে, মানুষের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের দম্ভটা পয়সা খরচের কত অনাবশ্যক উপায়ই না খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে!

সহসা একবার ঘোষালমহাশয় থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমার বাবার বিয়ের সময়ও চল্লিশজন চাকর-পাইক ছিল। মাইনে পায়নি কেউ দশ বছর, কেউ বা বারো বছর, কিন্তু তবুও ছাড়েনি। আমার মা এসেই তো সব তাড়ালেন! তাও বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, দশজন চাকর রাখতেই হয়েছিল, নইলে, বাবা বলেছিলেন আত্মহত্যা ক'রব!···ঐতেই তো সব গেল!

বিনীতভাবে জবাব দিলাম—তা তো বটেই, এ বাড়ীটা গোটা ঝাট দিতেই দশজন চাকর চাই।···কিন্তু এ জায়গাটায় দাঁড়ানো কি উচিত হবে!

ঘোষালমহাশয় খুশী হইয়া হাত পা নাড়িয়া বলিলেন—যতদিন বাস্তু আছেন, ততদিন ঘোষালবংশের অতিথিকে কেউ কামড়াবে না!···কিন্তু বুঝেছেন তো? দশটা চাকর নইলে যেখানে চলা সম্ভব নয়, সেখানে একটা চাকরও নেই! কী করব বলুন, বাবা তিনটে মর্টগেজ রেখে মারা গেলেন, সুদও ঢের জমে ছিল, পাওনাদাররা ছাড়লে না! যথাসর্ব্বস্ব গেল! থাকবার মধ্যে এই বাস্তু ভিটে আর স্ত্রীর যৌতুকের দরুণ পনেরো বিঘে জমি, কিন্তু তাতে আর চলে না।

আমি কিন্তু অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু তাঁহার বাস্তুর ভরসায় পূর্ব্ব-ইতিহাস শুনিতে একেবারেই রাজী ছিলাম না, সে কথা আমার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া তিনি পুনশ্চ চলিতে শুরু করিলেন। এইবারে মিনিট পাঁচেক চলিবার পর একটু আলোর আভাস পাইলাম, আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা উঠানের

মাঝখানে শুধু একটা ল্যাম্প বসানো ; জনবসতির আর কোন চিহ্ন চোখে পড়িল না।

ঘোষালমহাশয় আর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন—এই মহলটায় থাকি আমরা ; এইটেই এখনও দাঁড়িয়ে আছে।…চলুন আগে মা'কে দর্শন ক'রে আসি।

ভাঙ্গা জীর্ণ সিঁড়ির ধাপগুলি সন্তর্পণে লঙ্ঘন করিয়া রকের উপর উঠিয়া দেখিলাম সামনেই একটা ঠাকুর দালান, এবং তাহার মাঝখানে ছোট একটা পিঁড়ির উপর আরও ছোট একটি শ্যামামূর্ত্তি। একটি মধ্যবয়সী মহিলা বসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ঘোষালমহাশয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রদীপের আলোতে তাঁহার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, তবে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র রহিল না। বুঝিলাম, ইনিই ঘোষালগৃহিণী।

ঘোষালমহাশয় সহসা যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন, ওগো দেখ, ইনি বিদেশী ভদ্রলোক, কল্‌কাতার লোক, এখানে এসেছিলেন ইস্কুলে কি কাজে ; ফেরবার সময় গাড়ী ফেল ক'রলেন। সারারাত ব'সে থাকবেন ইস্টিশনে, তার চেয়ে এখানে তবু একটু আশ্রয় পাবেন ব'লে নিয়ে এলুম। …কাল সকালেই চ'লে যাবেন, ওঁদের কত কাজ, ওঁদের কি আর থাকবার যো আছে!

ঘোষাল-গৃহিণীর দৃষ্টির ভাবে বুঝিলাম যে, এ অপরাধ ঘোষালমহাশয়ের নূতন নয়, তিনি বহুদিন বৃথা তিরস্কার করিয়া করিয়া আজকাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল, এই অর্দ্ধোন্মাদ বৃদ্ধের সঙ্গে আসিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছি! গৃহিণী বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে তাঁহার স্বামীকে কহিলেন—ঐ লম্পটা ধ'রে ওঁকে ছোট ঘরে নিয়ে যাও ; আমি মুখ হাত ধোবার জল দিচ্ছি!

ঘোষালমহাশয় খুব খুশী, আসুন দাদা আসুন, এই যে এই পথ—

একটা দালান পার হইয়া তথাকথিত ছোট ঘরে পৌছিলাম। ঘরটিকে এখনকার দিনে আর ছোট বলা যায় না। মজবুত দেওয়াল হইতে চূণবালি প্রায় সবই খসিয়া পড়িয়াছে। খালি ইঁটের দেওয়ালের উপর আধখানা পর্য্যন্ত কলি ফিরানো, বোধ হয় ঘোষালমহাশয় নিজেই লাগাইয়াছেন। মেঝের কঙ্কালের উপর সোজাসুজি মাটি লেপা এবং পরিপাটি করিয়াই নিকানো। কিন্তু তা হউক—সমস্ত ঘরটির মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই তৃপ্তিতে মন ভরিয়া ওঠে। ঘরের একপাশে একটা চৌকী, তাহার উপরে ঘোষালমহাশয় তাড়াতাড়ি একটা কম্বল বিছাইয়া দিলেন, তারপর হাত মুখ ধুইবার জল আনিতে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই গাড়ুতে জল, একটা গামছা আনিয়া বাহিরের রকে সাজাইয়া দিলেন। তাহার পর, মুখ-হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিতেই, ঘোষাল-মহাশয় সহসা প্রশ্ন করিলেন—আপনার পরিচয় তো পেলাম না, আপনারা?

আমরা আপনাদেরই স্বজাতি, ব্রাহ্মণ। আমার নাম শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

বেশ, বেশ, নমস্কার। মশায় বিবাহ করেছেন কোথায়?

সবিনয়ে জানাইলাম—আজ্ঞে বিবাহ এখনও করিনি।

অকস্মাৎ যেন ঘোষালের চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, দুই-পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, বিবাহ করেন নি? বলেন কি? কুমার?

বিস্ময়ের কারণটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, আমার দাদারই এখনো বিয়ে হয়নি, আমি করব কি!

কিন্তু সেদিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, বার-কতক আপন মনেই কহিলেন—কুমার, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ! তাইত!···বলেন কি? এখনো বিবাহ করেন নি?

তারপর যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বাহির হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার

আকস্মিক ভাবান্তরের কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে আবার চৌকীর উপর মুড়িসুড়ি দিয়া বসিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, একটু পরেই একটা আসন ও এক গ্লাস জল লইয়া ঘোষালমহাশয় ঘরে ঢুকিলেন, পিছনে গৃহিণীর হাতে এক থালা জলখাবার।

—একটু জল খেয়ে নিন পূজো না হ'লে আজকের দিনে প্রসাদ দিতে পারব না তো! জল খেয়ে একটু ঘুমোন, পূজোর পর আপনাকে ডেকে নেব এখন।

আমাকে দুইবার বলিতে হইল না, কারণ আভ্যন্তরিক তাগিদই ছিল যথেষ্ট। ঝক্‌ঝকে একটি কাঁসার রেকাবীতে মুড়কী, গোটা দুই কলা এবং একজোড়া মোণ্ডা—জলখাবারের আয়োজনে আড়ম্বর না থাকিলেও মালে প্রচুর ছিল, আমিও যথেষ্ট তৃপ্তির সহিতই সেগুলি গ্রহণ করিলাম।

আমি খাইতে লাগিলাম, ঘোষালমহাশয় একটা হুঁকা হাতে করিয়া সামনে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিলেন, এখনও কি ঘোষালদের দিন ফিরিয়ে আনতে পারা যায় না? খুব যায়! স্বর্গীয় রমাকান্ত ঘোষাল মহাশয় আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন; তাঁর একদল লেঠেল ছিল এ অঞ্চলে নামকরা; তাদের নিয়েই তিনি মাঝে মাঝে নিশীথ-রাত্রে বেরোতেন ডাকাতি ক'রতে। তবে সাধারণ ডাকাতি তিনি ক'রতেন না—নাম-করা কৃপণ যে সব, কিম্বা নাম করা ডাকাত তাদেরই যথাসর্ব্বস্ব এক এক রাতে লুঠ ক'রে এনে প্রজাদের বিলিয়ে দিতেন। একবার এক পর্ত্তুগীজ ডাকাতদের জাহাজ আটকে ক্রোর-ক্রোর টাকার হীরে-মুক্তো নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল অমাবস্যা; নিজে শ্যামাপূজো ক'রতে গেলেন, বাড়ীসুদ্ধ লোককে হুকুম ক'রলেন ঘুমোতে। এমনি তাঁর কড়া হুকুম ছিল যে লুকিয়ে জেগে থাকবারও কারুর সাহস হ'ল না। তিনি পূজো শেষ ক'রে কোথায় যে মাটির নীচের ঘরে সেই সব মণিরত্ন নিজে হাতে পুঁতে রাখলেন তা আর কেউ জানতে পারলে না!…সে সব আজও আছে, এই ভিটেরই কোনওখানে।

আমি কহিলাম, আপনার পূর্ব্বপুরুষরা কেউ আর তার খোঁজ করলেন না ?

করবার যো কি ? তাঁর আদেশ ছিল যে, বংশে যখন খুব দুরবস্থা হবে তখনই শুধু ঐ টাকার খোঁজ ক'রতে পাবে। অমাবস্যার রাত্রে নিজ হাতে শ্যামাপূজা ক'রে একটি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে মায়ের কাছে বলি দিলে তবে তিনি প্রসন্ন হয়ে সে ধনরত্নের সন্ধান দেবেন—এই ছিল তাঁর নির্দ্দেশ ! বাবা প্রতি অমাবস্যাতেই শ্যামাপূজা ক'রে গেছেন, আমিও করি, কিন্তু ভরসা ক'রে নরবলি আমরা কেউই দিতে পারিনি, তাই মা আজও প্রসন্ন হ'চ্ছেন না।

অকস্মাৎ একটা হিম শৈত্য যেন আমার সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। মোণ্ডাটা ভাঙ্গিয়া খানিকটা মুখে দিয়াছিলাম তাহা গলায় বাধিয়া গেল, তাড়াতাড়ি খানিকটা জল খাইলাম।

ঘোষালমহাশয় কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছেন, আহাম্মুখ আমরা, মায়ের দয়া পাবো কি ক'রে ? নইলে ফাঁসির ভয় করি ? মা যার ওপর সদয় থাকেন, কেউ তাকে ফাঁসি দিতে পারে ? আর তা ছাড়া শুনেছি যে, টাকার জোরে সব-কিছুই করা যায় ; ক্রোর-ক্রোর টাকা যখন পাবো তখন আর ভয়টা কি ?

আমি কোন কথারই জবাব দিতে পারিলাম না ; বিস্তর টাকা থাকা সত্ত্বেও ফাঁসি-কাঠে উঠিতে হইয়াছে, এমনি একটা নাম প্রাণপণে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই মনে পড়িল না ; কেমন যেন সমস্ত চিন্তার মধ্যে মা ও ছোট বোনের মুখ মনে আসিয়া সব গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমি যে একেবারেই চুপ করিয়া আছি, তাহা এতক্ষণ পরে ঘোষাল-মহাশয়ের নজরে পড়িল, তিনি ছোট খাট রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা'হলে আপনি জলযোগ করুন, আমি উঠি, আমায় আবার স্নান ক'রতে হবে। দ্বিতীয় প্রহরের আর দেরি নেই বেশী—

তিনি উঠিয়া গেলেন, কিন্তু বাকি জল খাবার আর কিছুতেই উদরস্থ করিতে পারিলাম না। অপরিচিত স্থান, চারিদিকে বহুদূরব্যাপী জনমানবহীন ভগ্নস্তূপের রাশি, অন্ধকার রাত্রি আর সম্মুখে এই রক্ত-লোলুপ উন্মাদ। অবস্থাটা একবার মনের মধ্যে আগাগোড়া ভাবিয়া লইতেই সমস্ত গেঞ্জিটা ঘামে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহুক্ষণ কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলামনা, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া চৌকিটার উপর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু সহসা পাথরের উপর একটা কি ঘর্ষণের শব্দ কানে আসিতেই চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম ঘোষালমহাশয় স্নান সারিয়া রক্তবর্ণের চেলী পরিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন মাখিয়া প্রকাণ্ড একটা খড়্গ পাথরের উপর ফেলিয়া মাজিয়া লইতেছেন! ল্যাম্পের ম্লান আলোতেই তাহা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। বিরাট খাঁড়া!—অতি বড় মহিষও যে তাহার একঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পলায়ন করিতে হইবে—এবং এখনই, যেমন করিয়া হউক্! মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল, কেন সত্য পরিচয়টা দিয়াছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, অনুশোচনার সময় ইহা নহে। তাড়াতাড়ি জুতা জোড়া হাতে তুলিয়া লইয়া এক ফুঁয়ে ভিতরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলাম; তারপর কোনও রকমে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সে মহলের বাহিরে আসিলাম। কিন্তু বিপদ বাধিল তাহার পর!

অমাবস্যার রাত্রি, তাহাতে পাতলা মেঘে নক্ষত্রের আলোও ম্লান করিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায়, ইষ্টকস্তূপের মধ্যে, কোথায় পায়ে-চলার শীর্ণ পথরেখা আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, তাহার উপর ভয় এবং উত্তেজনায় দৃষ্টিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।...

জুতাজোড়াটা তাড়াতাড়ি পায়ে দিয়া লইলাম। সাপের ভয় আছে বটে, কিন্তু সেটা সম্ভাবনা মাত্র, ওটা যে নিশ্চিত মৃত্যু! তারপর যথাসাধ্য দ্রুত

চলিতে শুরু করিলাম। বার-বার ছোট-বড় হুঁচোট খাইতে খাইতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম জানি না, সহসা পিছন দিকে একটা আলোর আভাস পাইতে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার আর চলিবার ক্ষমতাও বিশেষ রহিল না। ঘোষালমহাশয় একটা আলো হাতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোধ হয় আমাকেই খুঁজিতেছেন! আলোও ক্ষীণ এবং দূর হইতে ভাল নজর চলিবার কথা নয়, কিন্তু তবুও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত-চন্দনের অনুলেপন এবং চোখে মুখে একটা অধীর আগ্রহ দেখিয়া হাতপায়ে কম্পন শুরু হইল। কোনরকমে জোর করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মাত্র দুই-এক পা গিয়াই প্রকাণ্ড একটা ইঁটে হুঁচোট খাইয়া পড়িলাম, একটা ইষ্টকস্তূপেরই উপর।

আঘাতের জন্যই হউক আর ভয়ের জন্যই হউক, আমার সমস্ত চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ জড়ের মত পড়িয়া থাকিবার পর একসময়ে একবার চোখ মেলিয়া দেখিলাম, আলো হাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নিষ্ঠুর লোলুপ দৃষ্টিতে ঘোষালমহাশয় আমার দিকে চাহিয়া আছেন; তাহার পরই চোখের সম্মুখে সব যেন লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল।

জ্ঞান যখন হইল, তখন পূর্ব্বাকাশ ফরসা হইয়া গিয়াছে; চাহিয়া দেখিলাম যে, ঠাকুর দালানেরই একপ্রান্তে আমি পড়িয়া আছি, পায়ে আমার একটা কম্বল চাপা, নীচেও কম্বল পাতা রহিয়াছে। পাশে রক্তলোলুপা কালীমূর্ত্তি এবং সম্মুখে রক্তাম্বর ঘোষালমহাশয় দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা চোখের নিমেষে মনে পড়িয়া গেল, শিহরিয়া উঠিয়া বসিলাম।

ঘোষালমহাশয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—উঁহু, উঠবেন না, উঠবেন না বাবু আর কোনও ভয় নেই, পূজা হয়ে গিয়েছে!

আমি কোন জবাব দিতে পারিলাম না, কেবল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—বড়ই ভয় পেয়েছিলেন, না বাবু? তা ভয় পাবারই কথা বটে? তবে সত্যি কথা বলতে কি, বলি দেবার ইচ্ছে আমার সত্যিই হয়েছিল; কিন্তু মা প্রসন্ন ছিলেন তাই ঘোষাল-বংশের এত বড় কলঙ্ক আর ঘটতে দিলেন না, নইলে পিতৃপুরুষের কোপে নষ্ট হ'য়ে যেতাম।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, খাঁড়াটা সাফ করছি, গিন্নী এসে বল'লেন—ওকি করছ?—জবাব দিলুম—আজ শনিবার, অমাবস্যা, ব্রাহ্মণকুমারও উপস্থিত; এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?—তিনি শিউরে উঠে ব'ললেন—বাপ্‌রে ওকথা ব'ল না, ঘোষালবংশের অতিথি তিনি, একথা ভুলে যাচ্ছ!—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাবার শেষ কথা, মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, অতিথিই নারায়ণ—ওর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।' সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল—একি কাজ করতে যাচ্ছি আমি!...ঘোষাল-বংশের এত বড় কলঙ্ক হবে আমার দ্বারা?...তখনই ছুটলুম আপনার কাছে মাপ চাইব ব'লে; গিয়ে দেখি আপনি নেই।... বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। মাকে বল্লুম—মা, ধন দৌলত দেবার ইচ্ছে না থাকে, রেখে দে, কিন্তু এতবড় পাপ ক'রতে পারব না!

তখনও যেন সব কথা বুঝিতে না পারিয়া, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন, উঠে, একটু মুখে হাতে জল দিয়ে নিন্ বাবু, মায়ের প্রসাদ একটু মুখে দিতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমার ব্যাগটা বার ক'রে দিন, আমাকে এখনই স্টেশনে যেতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, সে হয় না, ঘোষালবাড়ী থেকে অভুক্ত অতিথি চলে গেলে মুখে আর অন্নজল দিতে পারব না। যাই হোক্, মুখে কিছু আপনাকে দিতেই হবে।

অনিয়ম

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, ব্যানার্জ্জি সাহেবের সেদিন অফিসে পৌঁছিতে মোটে সতেরটি মিনিট দেরি হইয়া গিয়াছিল! অথচ এই তুচ্ছ কারণেই সেদিন অতবড় অফিসে কী একটা ভীষণ আন্দোলনই না শুরু হইয়া গেল। কোথায়ই বা রহিল হিটলার-মুসোলিনী-স্ট্যালিন-মাৎসুয়োকার গরম গরম বিচিত্র সংবাদ (অবশ্য অপ্রকাশিত) আর কোথায়ই বা রহিল প্রতিবেশীদের দুশ্চরিত্রতার ইতিহাস। অনাথবাবু রামেশ্বরবাবুর টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, ব্যাপার কি মশাই, আজ সত্যি-সত্যিই আটাশ তারিখ তো, না জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি ?

রামেশ্বরবাবু দেশলাই-এর কাটির সাহায্যে দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন, ম'লো না তো ?···চাক্‌রীটার ভয় হচ্ছে যে!

বিকাশ ওপাশ হইতে হাঁকিয়া কহিল, উঁহু, ম'লে পরে মড়াটাও অন্তত এসে নটা পঞ্চান্ন মিনিটে হাজারে দিত! এ তার চেয়েও বেশী কিছু।

হরিদাস ফোঁস্ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এমন জানলে একটা লটারীর টিকিট কিনে ফেলতুম!—আজ যা অঘটন ঘট্‌ছে, আমার অদৃষ্টেও লটারীর প্রাইজ উঠ্‌ত নিশ্চয়।

সত্যই ইহাতে বিস্ময়ের কারণ আছে। এই বিপুল বীমা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেণ্ট স্যর যতীন ছত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল বোধ হয় ইহার সহিত জড়িত আছেন কিন্তু ইহার মধ্যে মোট তিন দিনও তিনি লেট করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। দশটায় হাজিরা, তিনি ঠিক ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে অফিসে পৌঁছিবেনই—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, বারো মাস। কোন দিন কোন কারণেই ইহার অন্যথা হয় নাই, আজ যখন স্যর যতীন হইয়াছেন তখন তো

নয়ই, সেদিন যখন সাধারণ যতীন বাড়ুয্যে ছিলেন তখনও নয়। কিম্বদন্তী, লোকে তোপের সঙ্গে মিলানো ঘড়ীও তাঁহার অফিসে আসার সময়ের সহিত মিলাইয়া লইত।

অথচ জীবনের অন্য দিকে বৈচিত্র্যের কোন অভাব ছিল না লোকটির। ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাধারণ একজন অল্প-বেতনের কেরাণী। কিন্তু বছর চার-পাঁচ চাকরী করার পর প্রথম যৌবনেই যখন তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্ত্রী এবং পুত্র মারা গেল তখন তিনি সেই আঘাত সাম্‌লাইবার জন্য সহসা এই কর্ম্মস্থলটিকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তাহার ফলও ফলিল খুব শীঘ্র। তাঁহার অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অদ্ভুত সততা এবং সুকঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মস্থলেও দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে, বছর দশেক পূর্ব্বে, কোম্পানীর একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার সযত্ন সঞ্চিত এই দীর্ঘদিনের সমস্ত উপার্জ্জন দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টের পদটি কিনিয়া লইলেন।

কিন্তু এইখানেই তাঁহার জয়যাত্রা ব্যাহত হইল না। তিনি যেদিন এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক হইলেন সেদিন ছিল ইহার মুমূর্ষু অবস্থা কিন্তু আজ তাঁহারই তপস্যার ফলে উহা সর্ব্বপ্রধান বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে; সেদিনের মিঃ ব্যানার্জ্জিও হইয়াছেন স্যর যতীন। যদিচ তপস্যার এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধিতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, আজও চলিয়াছে তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম, এখনও তাঁহাকে প্রত্যহ ঐ ন'টা পঞ্চান্নতে হাজিরা দিতে হয়।

অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় না, কর্ম্মচারীরা আড়ালে বলে, বুড়ো যখ্‌ ক'রে যাবে। মুখে আগুন, কেউ নেউ তবু ভূতের মত খাট্‌ছে! কোম্পানীর একটি পয়সা লোকসান হ'ল তো যেন বুকের একখানা হাড় খসে পড়ল।

বন্ধু-বান্ধবরা বলে 'যন্ত্রমানব।' অন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা বলেন, ওকে কাজের ভূতে পেয়েছে। যেদিন মররে সেইদিন যদি ভূত ছাড়ে!

কিন্তু ব্যানার্জ্জি সাহেব এ সবে ভ্রূক্ষেপও করেন না। প্রত্যহ দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত এখনও ভূতের মত খাটেন এবং কর্ম্মচারীদের খাটান। কোথাও সামান্য মাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি-অনিয়ম তাঁহার সহ্য হয় না।

এ-হেন ব্যানার্জ্জি সাহেবের সতেরো মিনিট লেট—একটা বিস্ময়কর ঘটনা বৈ কি! বিশেষ করিয়া কাল ঐ কাণ্ডের পর! আজ সকলেই আশা করিয়াছিল যে তিনি হয়ত নটার পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাঁহার অফিসে এই অনাচার—এ অপমান যে তাঁহাকে কী দারুণ আঘাত করিয়াছে তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই কাল বুঝা গিয়াছিল। হয়ত সারারাত ঘুমাইতে পারেন নাই।

হরিশবাবু প্রবীন লোক, কহিলেন, ছোক্‌রার চাকরীটা তো গেলই, জেলও খাটতে হবে।

অনাথবাবু আধখানা বিড়ি ধরাইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে জবাব দিলেন, কিন্তু জেল খাটাতে গেলে একটা জানাজানি হবে না? ফার্ম্মের বদনাম তো বটে! জেলে বোধ হয় দেবে না।

হরিশবাবু বলিলিন, তবেই ওঁকে তোমরা চিনেছ!···সাহেবও যতদিন অফিসে আছেন, আমিও ততদিন, এক টেবিলে কাজ করেছি আগে।··· ফার্ম্মের বদ্‌নামের ভয়ে একটা অন্যায় চেপে যাবে, সে লোকই নয়। পুলিশ কেস অব্যর্থ!···নেহাত কাল ছুটির আগে ধরা পড়ল তাই; নিজে না দেখে হঠাৎ কোন কাজ করবার লোক নয়ত—নইলে কালই পুলিশ ডাকত। দ্যাখোনা এই রামেশ্বরবাবুর ডাক পড়ল ব'লে—

রামেশ্বরবাবু শেষ সুপারীর কুঁচিটাকে দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির করিয়া

নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, কিন্তু হরিশদা' আজকেই লেট্ হবার কারণ কি! এমন ব্যাপার একটা—

অনাথবাবু কহিলেন, ঐ ব্যাপার ব'লেই বোধ হয়। কাল সারারাত ঘুমোতে পারেনি. আজ সকালে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল—

সকলে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বারান্দায় সাহেবের পদশব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অফিস নিস্তব্ধ! সকলেরই কাজে অখণ্ড মনোযোগ। সাহেবের খাস চাপরাশী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কামরার জানলা খুলিতে শুরু করিয়া দিল, আর একজন টেবিল ল্যাম্পের সেড্‌টা ঠিক করিয়া দিয়া পাখা খুলিয়া দিল। এক কথায় অফিসের কাজ সেদিনের মত শুরু হইয়া গেল।

তখন দশটা বাজিয়া সতেরো মিনিট। এই সতেরো মিনিট লেটের ইতিহাসটাই এবার বলি—

সত্যই কাল ব্যানার্জ্জি সাহেব রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত তিনি নিজেকে এমনভাবেই জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে ইহার বিপুল অঙ্গের কোথাও কোন অনাচার ঘটিলে তাহা নিজেরই ব্যাধির মত তাঁহাকে যন্ত্রণা দেয়। সমস্ত রকমে ইহাকে গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে কত যত্নই না তিনি করেন! অথচ সেইখানেই এই ব্যাপার!

তবু ভাগ্যে তিনি অডিটারদের প্রতি এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার নির্দ্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। নহিলে হয়ত ব্যাপারটা ধরাই পড়িত না। নলিনীকে তিনি ভালো লোক বলিয়াই জানিতেন, কাজও করিয়াছে সে এ অফিসে বৎসর-দশেক। সেই বিশ্বাসেই তিনি তাহাকে বিনা জামিনে ক্যাশে কাজ করিতে দিয়াছিলেন।···তিনি যে মানুষ চেনেন, এ অহঙ্কার আজ স্যর যতীনের ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

ব্যানার্জ্জি সাহেব সারারাত ঘরের মেঝেতে পায়চারী করিয়াছেন।

ক্ষতি কিছুই নয়, মাত্র সাত শ' টাকা। এই টাকাটা যে-কোন সময়ে পথের লোককে তিনি দান করিয়া পর মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইতে পারেন। অফিস হইতে প্রত্যহ সাতশ' টাকা করিয়া চুরি হইতে থাকিলেও বহুদিন পরে হয়ত ব্যাপারটায় তাঁহার সন্দেহ হইতে পারিত—তাঁহার ব্যবসা এতই বড়। টাকাটা নয়—অনাচারটাই তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে বেশী।

অডিটারদের লোক কাল যখন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিল যে নলিনীবাবুর ক্যাশে সাতশ' টাকার গোলমাল আছে এবং ক্যাশ বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন, তখন যে নিদারুণ অপমানের আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন, তাহায় স্মৃতি জীবনে মুছিবার নয়। সে কথা মনে হইলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ইহার পর তিনি মুখ দেখাইবেন কি কবিয়া!

প্রথমটা বিশ্বাসও হয় নাই ঠিক। কিন্তু যখন কথাটা নিশ্চিন্তভাবেই প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন তিনি আর এক মিনিটও অফিসে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিদারুণ লজ্জার তাড়নায় এত বড় ব্যাপারটাও অমীমাংসিত রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাড়ী চলিয়া যাইতে হইল। শুধু বলিয়া গেলেন, 'যা হয় কাল এসে ঠিক করব। এখন কিছু করবার দরকার নেই।' এবং এই কর্ত্তব্যটা সারারাত ধরিয়াই ভাবিয়াছেন। শাস্তি দিতেই হইবে, তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের যশ কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তার জন্য তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবেন না কিছুতেই। শাস্তি তাহার প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা কাটিয়াও দেওয়া যাইতে পারে, পুলিশ পর্য্যন্ত গিয়া কেলেঙ্কারী প্রচার করার দরকার হয় না—কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে একটা গুরুতর পাপের সম্ভাবনাকে সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অপরাধীকে মার্কা দিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে অপরে না ঠকে। মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জ্জি সাহেব সকালের দিকে অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, কিছুক্ষণের জন্য অপমানটা ভুলিয়া অন্য কথাও চিন্তা

করিতে শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল নলিনীর নাটকীয় আক্রমণে।

ব্যানার্জ্জি সাহেব ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবেই আসিয়া অফিসের সামনে মোটর হইতে নামিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা কোথা হইতে নলিনী আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, একেবারে মারা যাবো স্যার, সপরিবারে শুকিয়ে মরব—শুধু দয়া ক'রে দুটো কথা শুনুন।

সে এক মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল। চাকর দারোয়ানেরা ছুটিয়া আসিল কিন্তু কি জানি কেন, সাহেব তাহাকে বাধা দিলেন না। বরং লিফ্‌ট্‌ম্যান রামমনোহর রূঢ়ভাবে নলিনীকে সরাইয়া দিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, কী বলবে বলো, উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বলো, অমন চেঁচামেচি ক'রো না।

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল বটে তবে শান্ত হইল না। কহিল, কোন বদ্‌খেয়ালীতে ওড়াইনি স্যার, ঈশ্বর জানেন। গত মার্চ্চমাসে স্ত্রীর ব্যাসিলাই ডিসেনট্রি, ছেলেটা গেল পুড়ে, মেয়েটার হাম 'লাট' খেয়ে গেল। বড় ডাক্তার না ডাকলে তিনটেই মরে যেত। তাই আর পারলুম না। এই আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, গত বছর ছোট ছেলেটা মরবার সময় যদি ওর গয়নাগুলো সব না যেতো তাহ'লে কিছুতেই এমন কাজ করতুম না!

স্যর যতীন কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, তাই ব'লে মনিবের টাকা চুরি করবে? না হয় মরেই যেতো—

নলিনী যেন শিহরিয়া উঠিল। আবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, চোখের সামনে সব ক'টা একসঙ্গে মরবে, এ কিছুতেই সইতে পারলুম না। আগে অতটা বুঝতে পারিনি, অল্প টাকা নিয়ে আস্তে আস্তে শোধ ক'রে দেব ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষে আর সামলাতে পারলুম না। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, দাঁড়িয়ে মরে যেতো—!

আর একবার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, যখন মনে হ'লো আমিই ওদের এনেছি, চিকিৎসার অভাবে মরে গেলে কী জবাব দেব ভগবানের কাছে, তখন সব ভুলে গেলুম। এইবারটি মাপ করুন, আমি যেমন ক'রে হোক—ভিক্ষে ক'রেও—ও টাকাটা শোধ ক'রে দেবো। নইলে সবাই মারা যাবো স্যার—

চাকর-দারোয়ানেরা পর্য্যন্ত সাহেবের ধৈর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সবটা শুনিলেন। বাধা দিলেন না, চলিয়া যাইবারও চেষ্টা করিলেন না। শুধু নলিনীর বক্তব্য শেষ হইলে শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা এখন তুমি বাড়ী যাও।

তাহার পর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া, কোনদিকে না চাহিয়া লিফ্‌টে গিয়া উঠিলেন। লিফ্‌ট ছাড়িয়া দিল।

নিজের কামরাতে ঢুকিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিপুল কাজ জমিয়া রহিয়াছে। সামনেই চার-পাঁচটি জরুরী ফাইল পড়িয়া রহিয়াছে, একটা বাজিবার আগে তাহাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। চিঠিরও স্তূপ জমিয়াছে, কতকগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত, সেগুলি এখনও খোলা হয় নাই। কতকগুলি অফিসেরই—বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিরা নির্দ্দেশের অপেক্ষায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এখনই এগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। কিন্তু তবু সাহেব চুপ করিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিলেন। প্রায় পনেরো মিনিট এমনি ভাবে কাটিবার পর তিনি রামেশ্বরবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামেশ্বরবাবুই ক্যাশের বড় বাবু। তিনি আসিতেই স্যর যতীন প্রশ্ন করিলেন, নলিনী এখানে কতদিন কাজ করছে?

একটু ভাবিয়া লইয়া রামেশ্বরবাবু জবাব দিলেন, আজ্ঞে তা প্রায় বছর আষ্টেক হ'লো।

হুঁ। কাজ কর্ম্ম করে কেমন?

রামেশ্বরবাবু যেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, খাটে খুবই, তবে এদানীং যেন ওর কামাইটা কিছু বেড়েছে—

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া ব্যানার্জ্জি কহিলেন, ওর বাড়ীর খবর কিছু জানেন? সংসারের অবস্থা?

আজ্ঞে না।

আমাদের অফিসের আর কেউ জানে?

বোধ হয় বিকাশ কিছু বলতে পারে, সে ঐ পাড়াতে থাকে।

আচ্ছা আপনি যান্। বিকাশকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

একটু পরেই বিকাশ আসিল। ব্যানার্জ্জি সাহেব ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি নলিনীর পাড়াতে থাকো?

বিকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। সাম্‌নাসাম্‌নি বাড়ী—

ব্যানার্জ্জি কহিলেন, ওদের সংসারে আছে কে?

বিকাশ কহিল, ওর স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। আর এক পিসিমা আছে তাঁর আবার পক্ষাঘাত।

অবস্থা কেমন ওদের?

বিকাশ একটু যেন লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, অবস্থা আর কেমন হবে বলুন। পঞ্চান্ন টাকা মাইনে পায় বটে, তেমনি আঠারো টাকা বাড়ী-ভাড়া দিতে হয়। তবু নীচের তলার অন্ধকার দুটো ঘর।

ব্যানার্জ্জি সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। খানিক পরে কহিলেন, কিন্তু আজকাল অত কামাই করছে কেন? রেস-টেস খেলে নাকি?

জিভ্ কাটিয়া বিকাশ কহিল, ওর তেমন প্রকৃতি নয়। কিছুদিন ধ'রেই ওদের বাড়ীসুদ্ধ বড্ড ভুগ্ছে। কেউ তো নেই—তাই এমন অবস্থা গেছে যে তিনটি সাংঘাতিক রুগী, মুখে জল দেবার লোক নেই তবু অফিসে এসেছে। ওর ছ' বছরের মেয়ে সকলের মুখে জল দিয়েছে—

হুঁ, আচ্ছা তুমি যাও।

বিকাশ চলিয়া গেল কিন্তু ব্যানার্জ্জি সাহেব তখনও কোন কাজে মন দিতে পারিলেন না ; অনেকক্ষণ পেপার ওয়েটটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া সহসা উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচের কর্ম্মব্যস্ত শহরের দৃশ্য চোখে পড়িল কিন্তু মনে গেল না। বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যৎ নয়, কোন্ এক বিচিত্র কারণের সূত্র ধরিয়া মন তাঁহার চলিয়া গিয়াছিল সুদূর অতীতে নিজের প্রথম যৌবনে—

আশ্চর্য্য! আজ নলিনী যে কাজ করে একদিন তিনি নিজে ঠিক ঐ কাজই করিয়াছেন, সম্ভবত ঐ একই চেয়ারে। সে আজ অনেকদিনের কথা, তখনও তাঁহার সংসার আছে, তখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন, কল্পনার জাল বোনেন। মাহিনা ছিল তাঁর আরও কম, মাত্র পঞ্চাশ। পনেরোটি টাকা দিয়া বৌবাজারের একটা সরু গলির মধ্যে ঘর ভাড়া করিয়া বাস করেন। তখন তিনি সাহেব নন, নিতান্তই যতীন।...

তাহারও একদিন ঐ অগ্নিপরীক্ষা আসিয়াছিল। তবে সেদিন তিনি নলিনীর মত পরাজিত হন্ নাই, প্রলোভনকে জয়ই করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মূল্যও বড় কম দিতে হয় নাই। স্ত্রী এবং শিশুপুত্র একই সঙ্গে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিল, দীর্ঘদিন ভুগিয়া তাঁহার চোখের সামনে প্রায় বিনা চিকিৎসাতে মারা গেল, তিনি তাহার কোন প্রতিকারই করিতে পারেন নাই।

উঃ, সেদিনের কথা মনে হইলে, আজও তাঁহার সারা বুক যেন ভাঙ্গিয়া পিষিয়া যায়! মায়ের অসুখে ও শ্রাদ্ধে স্ত্রীর গায়ের শেষ অলঙ্কারটিও বিক্রি হইয়া গিয়াছে, তখন হাতে একটিও পয়সা নাই। একটা সাধারণ ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকা হয় নাই প্রথমে, পাড়ার খানিকটা-হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চারুবাবু বই দেখিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন। তারপর রোগ যখন বাড়িয়া উঠিল তখন চারুবাবুর নিকট হইতেই কুড়িটা টাকা ধার করিয়া চার টাকা ভিজিটের

এম-বি ডাক্তার একজনকে ডাকিয়াছিলেন কিন্তু তখন আর তাহাদের বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না।

অথচ, স্যর যতীনের মনে পড়িল, তখন তাঁহার হাতেও অফিসের প্রচুর টাকা থাকিত। তখন এত হিসাব-নিকাশের বা পরীক্ষারও কড়াকড়ি ছিল না, ইচ্ছা করিলেই তিনি অনেক টাকা খরচ করিতে পারিতেন, পরে সুবিধামত ধীরে ধীরে ধীরে শোধ করা চলিত—কেহ জানিতেও পারিত না। শুধু ধর্ম্ম ও সত্যের মুখ চাহিয়া কিছুতেই তিনি সেদিন সে কাজ করিতে পারেন নাই।……

কিন্তু হয়ত তখনও আশা ছিল। বড় ডাক্তার ডাকা তো দূরের কথা, ভাল ইন্‌জেকশানগুলা কিনিয়া দিতে পারিলেও হয়ত সেদিন তাহাদের বাঁচানো চলিত। এমন করিয়া জীবনের যাহা কিছু প্রেয়, যাহা কিছু অবলম্বন তাহাদের অকালে হারাইয়া এই মরুভূমির মধ্যে দিন কাটাইতে হইত না।

স্যর যতীন অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। মূল্যবান কার্পেট, জুতাসুদ্ধ বসিয়া যায় তাহার মধ্যে, দামী চেয়ার, দামী আসবাবপত্র। আজ তাঁহার কর্ম্মস্থলে বিলাসের কত উপকরণই না সজ্জিত রহিয়াছে—কিন্তু আজ আর ইহার মূল্য কি? ঐ একখানা চেয়ারের দামে হয়ত সেদিন দু-দুইটা প্রাণ বাঁচানো যাইত। তাহারা থাকিলে সামান্য খোলার ঘরেও তিনি ইহার চেয়ে অনেক বেশী সুখে থাকিতে পারিতেন। তবু, সেদিন কিছুতেই তাঁহার সাহসে কুলায় নাই, পঞ্চাশটা টাকাও তিনি ঘরে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা বিবাহের কথা পাড়িয়াছে কিন্তু সে কথা মনে হইতেই ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিয়াছে। ছিঃ একবার তাহাদের সমস্ত ভার লইয়াও অক্ষমতার জন্য বেঘোরে মারিয়া ফেলিয়াছেন, আবার!… তাহার চেয়ে সারাজীবন নিঃসঙ্গ, নির্ব্বান্ধব কাটাইয়া দেওয়াও ভাল—

নাঃ, তাঁহার চেয়ে নলিনীর অনেক বেশী সাহস আছে, মানিতেই

হইবে! স্ত্রী-পুত্রকে তো সে বাঁচাইতে পারিয়াছে! কী ক্ষতি হইবে তাহার, যদি চাকরীটাই যায়? না হয় বড় জোর দুমাস জেলই খাটিবে—এই তো! তবু মুটেগিরি করিয়াও বাঁচিতে পারিবে! বর্ত্তমানে না হোক্, অন্তত ভবিষ্যতের আশাতে থাকিবে, একদিন তো আবার সোনার সংসার গড়িয়া তোলার স্বপ্ন দেখা তাঁহার মত উপহাসের বস্তু হইয়া উঠিবে না! ••

স্যর যতীন যেন খানিকটা ছট্‌ফট্ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। দু-একটা ফাইল খুলিলেন, কিন্তু কাজে মন বসিল না। খানকতক চিঠি পড়িবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। আবার উঠিয়া আসিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইলেন। নীচে অসংখ্য লোক কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছে, চারিদিকে কত মানুষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আপন বলিতে একটি লোকও নাই। এ জীবন যাপনের চেয়ে জেলখাটা এমন কি ফাঁসিকাঠে ওঠাও শ্রেয়!

কিন্তু, স্যর যতীনের মনে পড়িল, নলিনীকে যদি মাপ করেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে অফিসের সমস্ত 'ডিসিপ্লিন্' ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর কোন লোককেই হয়ত তিনি ভবিষ্যতে শাসন করিতে পারিবেন না। সকলেই ঐ নজীর পাড়িবে—

অথচ, তাহাকে শাস্তি দেবার যত কল্পনা সকালে ছিল এখন আর তাহার কোনটিতেই তাঁহার মন যেন সায় দিতেছে না। নলিনীর বর্ণিত পাশাপাশি রোগশয্যার সঙ্গে আর দুটি রোগশয্যা তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া সব যেন গোলমাল করিয়া দিতেছে—

চোখ বুজিয়া ব্যানার্জ্জি সাহেব অনেকদিন পরে স্ত্রীকে ভাবিবার চেষ্টা করিলেন। পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে সুন্দর একটি মিষ্ট হাসি। একটি দিনের জন্যও সে কোন অনুযোগ ক'রে নাই, কোন অভাব-অভিযোগই সে তাঁহাকে শোনায় নাই। মুখ বুজিয়া তিলে-তিলে মরিয়াছে তবু একটা তিরস্কারের ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই।

শুধু মরিবার সময়ে, কথা বন্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, চুপিচুপি বলিয়াছিল, যদি পয়সাকড়ি যোগাড় করতে পারো তো ভালো ক'রে আমার শ্রাদ্ধটা ক'রো। আর, তুমি নিজেই ক'রো—

উঃ—

স্যর যতীন শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া অনেকদিন পরে জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন, এতদিন বুঝিনি মিনু, তোমার আসল শ্রাদ্ধটাই এখনও বাকী রয়েছে। তোমার জন্যে আমি সব চেয়ে বড় স্বার্থত্যাগই করব—। ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা যায় যাক্—

টেবিলের বোতাম টিপিতেই চাপরাশী আসিল। কিন্তু সাহেবের মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার ঘরে আসিতে ভরসা হইল না, সে দ্বারপথেই দাঁড়াইয়া গেল। সাহেব শুধু বলিলেন, রামেশ্বরবাবু!

রামেশ্বরবাবু যখন ঘরে ঢুকিলেন সাহেব তখন কী-একটা চিঠির জবাব লিখিতেছেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, দেখুন কাল একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। নলিনী বেচারার বেশী দোষ নেই। আমিও সেদিন একটা বিশেষ দরকারে ওর কাছ থেকে সাতশ' টাকা চেয়ে নিয়েছিলুম, 'ভাউচার' দিইনি। আমারও মনে নেই, বিপদে আপদে ও নিজেও ভুলে গেছে—। ওটা আমার নামেই খরচা লিখে নেবেন।

রামেশ্বরবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরে সাহেব কহিলেন, আচ্ছা, আপনি যান তাহ'লে। আর হ্যাঁ, ওকেও না হয় একটা লোক পাঠিয়ে খবরটা দিয়ে দিন্—

জীবনের জয়মাল্য

মেহগ্নিকাটের ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড সিক্রেটেয়ারটার উপর জুতাসুদ্ধ পা দুইটা তুলিয়া দিয়া সোমনাথ কহিল, বিয়ে? পাগল হয়েছ?...একপাল ছেলেপিলে, তাদের হাজারো রকমের ঝঞ্ঝাট আর বায়না—তার ওপর এক মোটাসোটা গিন্নি, যিনি দিনরাত কাপড়-গয়না-টয়লেটের ফর্দ্দ, অনাবশ্যক কৌতূহল আর অসংখ্য কৈফিয়ৎ নিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌বেন! অসম্ভব, ও সব ঝামেলা আমার নার্ভ্‌স্‌ একদিনও সহ্য করতে পারবে না।

ইন্দ্রজিৎ পাইপে তামাক ভরিতে ভরিতে কহিল, কি নিয়ে থাকবে তা হ'লে? শুধু টাকা? আর টাকাই বা তাহ'লে কার জন্যে?

সোমনাথ জবাব দিল, কি নিয়ে থাকব মানে কি? আমাকে নিয়ে থাক্‌ব। আমারই জন্যে সব। টাকা দরকার আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে; আমার মোটর চাই, রেস চাই, পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া চাই, ভাল স্যুট্‌ চাই, আরামে বাস করবার জন্য! যা কিছু সব আমি। তোমরাও কি দিনরাত ঐ বিশেষ 'আমি'টির পাশেই ঘুরছ না?

ইন্দ্রজিৎ মুহূর্ত্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু যে উপায়ে টাকা তুমি রোজগার করছ, তাতে সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য কি কোনদিন পাবে? ঐ যে গরীব লোকগুলি সরল বিশ্বাসে তোমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে যাচ্ছে, ওদের অভিশাপ কি তোমার সুখের পথে আগুন ছড়িয়ে যাবে না। আর এই দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, এরাও কি তোমায় ঐ টাকা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে দেবে?

চুরুটটা দাঁতে চাপিয়া সোমনাথ কহিল, কাওয়ার্ডস্‌!...ওসব অভিশাপে আমার কি হবে? তারা প্রত্যেকেই সাবালক, তারা জানে যে মানুষ চারিদিকে বসে আছে ঠকিয়ে টাকা নেবার জন্যে। সব জেনেও তারা কি

জন্যে আমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে যাচ্ছে? তারাও আল্‌টপ্‌কা টাকা পাবে, এই লোভে তো? তাতে যদি তারা না পায় বা ঠকে, সে কি আমার দোষ?···আর তা ছাড়া দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার কথা যা বল্‌লে, ঐটেই তো আমার মূলধন।···কিছু না দিলে অর্থ আসবে কোথা থেকে? তোমার এ্যাটর্ণির অফিসে বসে দুশ্চিন্তা কি কিছু কম করতে হয়? সেটা পরের জন্য—এটা না হয় নিজের জন্য, এইটুকু তফাত তো?

কেরাণী নরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাইরে বসে আছেন।

সোমনাথ কহিল, বলোগে এখন ভেতরে লোক আছেন, মিনিট পাঁচেক পরে নিয়ে এস।

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যা ভাল বোঝ করো ভাই। কিন্তু আমার বড় ভয় হয়।

তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, আজ তবে আসি—

পাশের অন্য একটা পর্দ্দা সরাইয়া সে বাহির হইয়া গেল!

সোমনাথ আই-এ ফেল করিয়া দাদার সহিত বিবাদ করে এবং তেরো টাকা হাতে লইয়া একদা ধানবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আজ ঠিক তেরো বৎসর আগেকার কথা। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সে অনেক কিছুই করিয়াছে জীবিকার্জ্জনের জন্য, সম্প্রতি একটি পথ সে আবিষ্কার করিয়াছে যাহাতে দ্রুত অনেক টাকা উপার্জ্জন করা যায়। কোন একটি লিমিটেড্‌ কোম্পানী খুলিয়া কিছুদিন তাহার শেয়ার বিক্রি করে, তাহার পর সহসা একদিন বিচিত্র উপায়ে কোম্পানীকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি আদালতে পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার বর্ত্তমান উদ্যমটা ব্যাঙ্ক; স্থাপনের সময় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে যাঁহারা এই ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়া অন্ততঃ কিছু টাকা রাখিবেন, তাঁহাদের শেয়ারের অংশের দশগুণ পর্য্যন্ত টাকা,

পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নাম মাত্র সুদে ধার দেওয়া হইবে—অবশ্য ছয় মাস পরে! বলা বাহুল্য যে শেয়ার ক্রেতার অভাব হয় নাই, টাকা জমাও যথেষ্ট পড়িয়াছিল, কিন্তু এদিকে ছয় মাসেরও বেশী বিলম্ব নাই। সেই কথাটা চিন্তা করিয়াই সোমনাথ তাহার এ্যাটর্ণী বন্ধু ইন্দ্রজিৎকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এবং কোন্ আইনের পথ ধরিয়া এতগুলি লোকের টাকা অন্তর্হিত হইবে, তাহাও বিশদ্ভাবে বুঝাইয়াদিয়াছে। এখন সে নিশ্চিন্ত···

নরেশবাবু যাঁহাকে লইয়া আসিলেন, তাঁহার বয়স খুব বেশী হয় নাই কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াই গিয়াছেন। বেশভূষাও অত্যন্ত মলিন, জীর্ণ। তিনি ঘরে আসিতে সোমনাথ চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন··· তারপর, কি করতে পারি আপনার জন্য বলুন দেখি? শেয়ার চান? কত টাকার? বেশী শেয়ার আপনাকে তো আর দিতে পারব না—

মলিন মুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, বেশী টাকাই বা কোথা পাবো বলুন? দশখানি শেয়ারের প্রথম কিস্তির টাকা আব সেভিংস ব্যাঙ্কের পঞ্চাশটি টাকা জমা, এই একশ'টি টাকাই যে ক'রে এনেছি তা ঈশ্বর জানেন। একটি পয়সা জমাতে পারিনি অথচ মেয়ে আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছে; স্ত্রীর গয়নাও নেই, ছেলে-পিলের অসুখে বিসুখে সব গেছে, শেষ যে-টি ছিল তাই বেচে এই টাকা ক'টি এনেছি—

প্রসন্ন হাস্যে অভয় দিয়া সোমনাথ কহিল, তা দশখানা শেয়ার আপনাকে দিতে পারব। যান ঐ ঘরে, টাকা জমা দিয়ে দিন—শেয়ার সার্টিফিকেট পরে পাঠানো হবে।

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, কিন্তু তার আগে একটি কথা জিগ্যেস্ করতে চাই, টাকাটা ঠিক পাবোত? মেয়ে পার করার আর কোন উপায় নেই আমার!

সোমনাথ কহিল, বিলক্ষণ! টাকা পাবেন না? কোম্পানীর আইন

যখন হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই পাবেন, নইলে জুচ্চুরির কেসে পড়বো যে!··· তবে হ্যাঁ, আর একটা জামিন চাই।

ব্যাকুলভাবে বৃদ্ধ কহিলেন, জামিন? জামিন কোথা পাবো?

সোমনাথ কহিল, ওঃ সেটা কিছু নয়। হয় এই ব্যাঙ্কেরই কোন শেয়ার হোল্ডার নয়ত আপনার কোন অফিসের বন্ধুকে দিয়ে একটা সই করিয়ে দেওয়া। আর তা-ও যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তো সে ব্যবস্থাও ক'রে দেওয়া যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাইয়া বাহির হইয়া যাইবার আগে আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, শেয়ার বেশ বিক্রী হচ্ছে, না?

সোমনাথ স্মিতহাস্যে কহিল, শেয়ার? আপনাকে দশখানি দিলে আর মোটে ন'খানি বাকী থাকবে। তার মানে এর পর যিনি আসবেন তাঁকে পুরো দশখানাও দিতে পারব না। আচ্ছা নমস্কার।

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সোমনাথ ডেস্কের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং বাকীগুলি পুনরায় রাখিয়া দিয়া ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টার বোতাম টিপিল।

নরেশবাবুই ঘণ্টার উত্তরে প্রবেশ করিলেন, হাতে একতাড়া নোট একটি রবারের সূতায় বাঁধা। কহিলেন, আজকের কলেকশান এই সব; খুচরো টাকাগুলি রেখে দিলুম।···আজ ছ'মাস পুরো হ'ল, কাল থেকেই কিন্তু 'লোনের' দরখাস্ত আসবে—

সোমনাথ কহিল, জানি।···আমার এখানে আসা আজকেই শেষ। ব্যাঙ্কের তহবীলে শ' দু'তিন টাকা আছে, ওটায় আর হাত দিও না। কাল থেকে দরখাস্ত পড়বে যখন, তখন এখনও সাতদিন সময় আছে, এই সাতদিনে যা আসবে সব তুমি নিও, দারোয়ানটাকে মাইনে বলে কিছু দিও

না, এম্‌নি শতখানেক টাকা দিয়ে দিও। তারপর চাবি ইন্দ্রজিতের কাছে পৌঁছে দিও। আচ্ছা আমি চল্লুম—

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নজরে পড়িল, দেবেনবাবু দ্বারপ্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। দেবেনবাবু সি-আই-ডি'র লোক, মোটা বেতন পান। আরও বার-দুই ইঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। তখন সোমনাথ ভয় পায় নাই, একরকম করিয়া ইহাকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু আজ যেন সহসা বুক কাঁপিয়া উঠিল।

তবুও জোর করিয়া মুখে অভ্যর্থনার হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, আসুন দেবেনবাবু; নরেশ, তুমি বাইরে বোসগে—

দেবেনবাবু, নরেশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, বাইরে আমার দু'জন সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টার আছে, দেখে ভয় পাবেন না, কিম্বা একেবারে বাইরে যাবেন না। দারোয়ানটাকেও বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করবেন না, পুলিশ আছে বাইরে—

তাহার পর সোমনাথের টেবিলের সামনে একটা দামী চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, সোমনাথবাবু, আজ যে আপনার ব্যাঙ্ক খোলার পর থেকে ছ'মাস পুরো হ'লো, তা আমি ভুলিনি। আজই যে আপনার শেষ এখানে আসা, তাও আমি অনুমান করেছিলুম—

সোমনাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আমাকে কি আপনি এ্যারেস্ট্ করতে চান?

দেবেনবাবু কহিলেন, না, ঠিক এ্যারেস্ট্ নয়; তবে বোঝাপড়াটা না হওয়া পর্য্যন্ত একটু নজরে রাখতে চাই—

মিনিট-দুয়েক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সোমনাথ নোটের তাড়াটা উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল, দেখুন, আমি জানি যে আমাকে এ্যারেস্ট্ করার ক্ষমতা এখন আপনার নেই, ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টেও আমার কোন ভয় নেই। তবে এখন বা পরে আমাকে আপনি জ্বালাতন করতে পারেন, এ-ও

জানি। আমাকে যখন এই কাজ ক'রেই খেতে হবে, তখন আপনাকে ক্ষুন্ন ক'রে লাভ নেই।...এই তোড়াতে প্রায় হাজার টাকা আছে, ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।

দেবেনবাবু মধুর হাসিয়া নোটের বাণ্ডিলটি টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আচ্ছা, আসি তা'হলে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

সোমনাথ মিনিট পনেরো পরে যখন নীচে নামিয়া আসিল তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। তাহার বিরাট গাড়ীখানা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সোমনাথের মনে পড়িল এখন কিছুদিন তাহাকে গা-ঢাকা দিয়া থাকিতেই হইবে; সুতরাং কলিকাতা শহরে, অন্ততঃ বছর-খানেকের জন্য, আজই তাহার শেষ রাত্রি, কিছুদিনের মত এই শহরকে অনুভব করারও ইহাই শেষ সুযোগ! সে শোফায়ারকে গাড়ী গারাজে রাখিয়া দিবার আদেশ দিয়া, বহুদিন পরে হাঁটিতে শুরু করিল।

তখন তাহার ঠিক বাসায় ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। সাফল্যের আনন্দে মন তাহার পরিপূর্ণ, ঠিক যেমনটি সে কল্পনা করিয়াছিল, প্রায় তেম্‌নিই ঘটিয়াছে। দেবেনবাবুকে অনর্থক হাজার টাকা দিতে হইল বটে; কিন্তু তা হউক, অর্থ উপার্জ্জনেই তাহার আনন্দ—সঞ্চয়ে নহে। এই ছয় মাসে সে যত টাকা পাইয়াছে সমস্তই সে এক মুহূর্ত্তে দান করিতে পারে, কারণ সোমনাথ জানে যে ইচ্ছা করিলে সে পুনরায় উহার চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জনও করিতে পারিবে।

সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে কখন যে বৌবাজারে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই। আজ যেন শহরের এই কোলাহল-মুখরিত রাজপথ অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, এই আলো, এই শব্দ যেন নিবিড় করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

কিন্তু সহসা তাহার চমক্ ভাঙ্গিল কালিদাসকে দেখিয়া। কালিদাস তাহার বাল্যবন্ধু, দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহার সহিত দেখা। প্রকাণ্ড এক পুঁটুলি বাজার, কঁড্‌লিভার অয়েলের শিশি, হরলিক্‌স্ প্রভৃতি অতি কষ্টে এক হাতে সামলাইয়া অন্য হাতে রাস্তার পাশের ঠেলাগাড়ী হইতে জাপানী পুতুল বাছিতেছে—

সোমনাথ তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল, আরে কালিদাস যে! কী ব্যাপার?

মুখ তুলিয়া সোমনাথকে নজরে পড়িতেই কালিদাসের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সস্নেহে কহিল, সোমনাথ তুই!···বহুদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। কি করছিস্ আজকাল? পোযাক দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছিস্—

সোমনাথ জবাব দিল, আমি ভালই আছি। তোর খবর কি? এখানে কি করছিস্?

কালিদাস পুনশ্চ দ্রুতহস্তে পুতুল বাছিতে বাছিতেই জবাব দিল, এই—ছেলেটার জন্যে একটা পুতুল বাচছি ভাই! ছেলে আমার নবাবপুত্তুর, রোজই তার নতুন একটা পুতুল চাই। নইলে মহা কান্নাকাটি—

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, ছেলে যখন হয়েছে তখন বিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস্। কবে করলি?

কালিদাস কহিল, বছর চারেক হ'ল।

সোমনাথ প্রশ্ন করিল, ক'টি ছেলে?

কালিদাস জবাব দিল, ঐ একটি, বছর দুয়েকের হ'ল। তোর ক'টি?

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, ছেলের মধ্যে আমি, বৌয়ের মধ্যেও আমি।

কালিদাস বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে? বিয়ে করিসনি বুঝি?··· সে কিরে? বিয়ে কর্, বিয়ে কর্,—

ততক্ষণে পুতুল কেনা শেষ হইয়াছে, সে সোমনাথকে কহিল, একটু' দাঁড়া ভাই, পো'টাক ছানা কিনে আনি—

বলিতে বলিতেই সে দৌড় দিল ছানার দোকানে। তাহার চোখ-মুখের প্রদীপ্ত একাগ্রতা এবং অসাধারণ ব্যস্ততা দেখিয়া সোমনাথ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এই কালিদাস তাহাদের ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অলস এবং মন্থর ছিল, তাহার মধ্যে এত উদ্দীপনা আসিল কোথা হইতে ?

কালিদাস প্রায় ছুটিতে-ছুটিতেই ছানা কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। সোমনাথ কহিল, ব্যাপার কি, এত ছুটোছুটি করছিস্ কেন ? এত জিনিষ কিনে কি ক'রে নিয়েই বা যাবি ?

কালিদাস একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, তুই কোন্ দিকে যাবি ? আমার আবার ছ'টা কুড়িতে ট্রেণ ! আমি বালিগঞ্জে থাকি কিনা।····যাবি ওদিকে ?···

সোমনাথ অন্যদিন হইলে হয়ত কালিদাসের এই স্বার্থপর ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া বলিত, না। কিন্তু সে দিন কি মনে হইল কে জানে, সে-ও তাহার সহিত জোরে জোরে হাঁটিতে শুরু করিল। কালিদাস কতকটা কৈফিয়তের স্বরেই বলিয়া চলিল, মোটে একলা থাকতে পারে না। একটু দেরী ক'রে গেলেই বুকে মাথা রেখে এমন কাঁদে যে দেখলে বড় কষ্ট হয়।···আর শরীরটাও ভাল নেই কিনা। ছেলেটা হবার পর থেকেই সেই যে শরীর খারাপ হ'লো আর কিছুতেই সারতে পারলে না—

সোমনাথ কহিল, কড্‌লিভার বুঝি তারই জন্যে ?

কালিদাস কহিল, হ্যাঁ। তাই কি কিন্‌তে দেয় ! বলে 'আমার এ ছাই-ভস্ম দেহের জন্যে তোমাকে আর বাজে পয়সা খরচ করতে হবে না।' গত মাসে হাতে পায়ে ধরে রাজী করিয়েছিলুম, তাই একটি বোতল খেয়েছিল। খেয়ে শরীরটা, বল্‌তে নেই, একটু ভালই হয়েছে দেখে আজ একেবারে আর এক বোতল কিনে নিয়ে যাচ্ছি।···কত রাগারাগি করবে এখন—

সোমনাথ তাহার অনর্গল বকুনিতে বাধা না দিয়া অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এ কিসের আলো এ লোকটির মুখে? এ কোন্ আনন্দের আকর্ষণ?…একটু পরে সে প্রশ্ন করিল, কি করিস্ এখন?

কালিদাস জবাব দিল, বার্ম্মাশেলে কাজ করি। পঁচাশি টাকা মাইনে, তা তাইতেই আমাদের বেশ চলে যায়। মোটে তো আড়াইটি প্রাণী, কি-ই বা এমন পয়সার দরকার আমার?…

সোমনাথ যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল। মাত্র পঁচাশি টাকা? এ লোকটা পাগল নাকি? সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, গিন্নীর কাপড়গয়না ঐ টাকাতেই জোগাতে পারিস্?

কালিদাসের সমস্ত মুখ প্রেমের গর্ব্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল, কাপড় জামা দিয়ে ভালবাসা আমাকে কিন্‌তে হয়নি। একবার শুধু সখ ক'রে একখানা কাপড় কিন্‌তে চেয়েছিল, দোকানে খোঁজ ক'রে দেখি তার দাম মোটে পাঁচ টাকা, আর এই এতদিনের মধ্যে একটি মুক্তোর আংটি চেয়েছে। তবে ঐ এক আব্দার—'দিন রাত আমার কাছে থাকো!' একদিন যদি আফিসের কাজে ফিরতে সাড়ে-সাতটা আটটা হয়ে যায় তাহ'লে আর রক্ষে নেই, ছেলে মানুষের মত কাঁদে—বলে 'আর আমাকে তুমি ভালবাসো না'!…

ততক্ষণ শিয়ালদা' আসিয়া পড়িয়াছে। মোড়টা পার হইতে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কালিদাস কহিল, ঐ যাঃ, কিছু মিষ্টি তো নেওয়া হয়নি! দাঁড়া এক মিনিট—

আবার সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল সন্দেশওয়ালার দোকানে, কোন মতে পয়সা বাহির করিয়া দিয়া ঠোঙ্গাটা পকেটে পুরিয়া আবার ছুট্—

কাছে আসিয়া কহিল, আর মোটে দু-টি মিনিট বাকী আছে, একটু পা চালিয়ে আয় ভাই—

তাহারও যেমন মনে হইল না নে, এই লোকটার তাহার সহিত ছুটিবার

কোন কারণ নাই, সোমনাথও সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না। ছুটিতে ছুটিতেই কালিদাস কহিল, ছেলেটার আবার জিবেগজায় ভারী লোভ, একদিন ভুলে গেলে রক্ষে থাকে না। আর কী যে দুরন্ত হয়েছে কি বল্‌ব! তেমনি বুদ্ধিও, কে বলবে যে দু'বছরের ছেলে।

প্ল্যাটফর্ম্মের কাছাকাছি আসিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা শুরু হইল। কালিদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে খানিকটা ছুটিয়া গিয়া ছুটিতে-ছুটিতেই মুখ ফিরাইয়া কহিল, ঐ যাঃ, তোর ঠিকানাটা তো নেওয়া হ'ল না, একদিন আসিস্‌ না এখানে, কসবা ঘোষালপাড়া—

শেষ মুহূর্ত্তে কোনমতে সে জিনিষপত্রসুদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। আর একটু হইলে বোধহয় পড়িয়াই যাইত।

বহুক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মের প্রবেশপথে সোমনাথ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যেন কতকটা টলিতে টলিতেই গিয়া একটা ট্যাক্সীর ভিতর বসিয়া পড়িল। তাহাকে যেখানে খুশী চালাইবার আদেশ দিয়া সে গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া সুগভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজিল। জীবনের মধ্যপথে আসিয়া আজ সে প্রথম অনুভব করিল যে সে ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত! সে আজ একান্তভাবে শুধু বিশ্রাম চায়।*

* এই গল্পের স্থানে স্থানে O. Henry-র প্রভাব আছে।

রাজপথের বসন্ত

কলিকাতার রাজপথেও বসন্ত আসে। চাঁদের আলো ঠিক মানুষের গায়ে আসিয়া না পড়িলেও রাস্তার বিদ্যুৎবাতিগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। দক্ষিণের বাতাসে মন অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, ট্রাম-বাস-মোটরের কোলাহল না কমিলেও পথ কেমন যেন জনহীন বলিয়া মনে হয়। পথিকের মনেও সে নিঃসঙ্গতা আঘাত করে, মনে হয় এ পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা, কোথাও কেহ তাহার আত্মীয় বা বন্ধু আজ আর নাই, কিন্তু তবুও তাহার পথে-পথেই ঘুরিতে ইচ্ছা করে।

এমনিই এক বসন্ত-রজনীতে বীরেশ্বর মেস হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিল। মেস তাহার একেবারেই ভাল লাগে না, বিশেষ করিয়া এই রকম সন্ধ্যায়। পাচক-চাকরের কোলাহল, একঘেয়ে রান্নার গন্ধ, বাবুদের অশ্লীল রসিকতা, ইহার কোনটার সহিতই তাহাব খাপ খায় না। তাহার বিশ্বাস, চোখ কান বুজিয়া মেসে গিয়া একবার স্নান করিয়া খাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে বাস করা যায় না।

কিন্তু এমনই তাহার অদৃষ্ট, মেসেই তাহার প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দেশ হইতে ম্যাট্রিকুলেশান এবং সদর হইতে বি-এ পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে কিন্তু তাহার জন্য কখনও মেসে বা হোস্টেলে থাকিতে হয় নাই। সদরে তাহার মামার বাড়ী আছে, সেখানে মামীমা ও মামাতো ভাই-বোনেরা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, কখনও বাড়ীর অভাব সে বুঝিতে পারে নাই, আজও তাহাদের কথা মনে হইলে চোখে জল আসিয়া পড়ে। বি-এ পাশ করিবার পর কিন্তু তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল; উদ্দেশ্য আইন পড়া ও চাকরীর চেষ্টা দেখা, যেটা আগে হয়! এবং সেই হইতে সে কলিকাতাতেই আছে, ঐ মেসে!

মামা দশ টাকা ও বাবা দশ টাকা পাঠান, তাহার উপর নিজের গোটা-পনেরো টাকার ট্যুইশন সম্বল করিয়া সে আইন পড়িয়াছে, এইবার পরীক্ষাও দিবে—তবে চাকরীর কোন আশাই আর নাই। ইতিমধ্যে দরখাস্ত করিয়াছে সে হাজার খানেক, সুপারিশ ধরিয়াছে শ'পাঁচেক এবং 'ইণ্টারভিউ'ও শ'তিনেকের কম দেয় নাই; কিন্তু পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয়ের পরিবর্ত্তে একটি ছোট রকমের কেরাণীগিরিও তাহার জোটে নাই। মাস ছয়েক হইল সে-চেষ্টা সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, অনর্থক পয়সা খরচ করিতে আর তাহার মন ওঠে না।

তাহার পরিবর্ত্তে সে সাহিত্য ধরিয়াছে। সারা দুপুর ধরিয়া মেসে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গল্প লেখে এবং সেগুলিকে পুনশ্চ 'কপি' করিয়া 'উপযুক্ত ডাক-মাশুল সহ' মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অফিসে পাঠাইয়া দেয়। তাহার মধ্যে গোটাকতক ইতিমধ্যে ছাপাও হইয়াছে, আরও হইবে এরূপ ভরসা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, কোথা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া জন-দুই সম্পাদক তাহাকে চিঠিও দিয়াছেন। সুতরাং গল্প লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করাও নিতান্ত দুরাশা নয়—এইরূপ একটা কথা কিছুদিন যাবৎ তাহার মাথায় দেখা দিয়াছে।

সে কথা এখন থাক্—কী বলিতেছিলাম,—

বীরেশ্বর কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট দিয়া হাঁটিতেছিল। একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য, বিরহের আভাস-মিশানো একটা অস্পষ্ট ক্লিষ্টতা, তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; সে হাঁটিতেছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে। যে কখনও কাহাকেও ভালবাসে নাই, তাহারও মনের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে বিরহের উপলব্ধি হয়, তেম্‌নিই একটা অকারণ বেদনা, তেম্‌নিই অজানা বেহাগের সুর তাহার মনে। তাহার মনে হইতেছিল, চির-পরিচিত, প্রতিদিনকার এই রাজপথ সহসা যেন কোন্ সুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সীমাহীন, অনন্ত পথের একমাত্র পথিক সে! আর

কোথাও কেহ নাই, পথের পিছনেও কেহ নাই, সামনেও কেহ নাই—তাহার জীবনে যেন কোনও কালে কেহ ছিল না।

রাত ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিল কিন্তু বীরেশ্বর মেসে ফিরিবার কথা ভাবিতে পর্য্যন্ত পারিল না। হাতীবাগানের মোড় পার হইয়া শ্যামবাজারের মোড়ে পড়িল, সেখান হইতে শোভাবাজারের মধ্য দিয়া আসিয়া পড়িল, অত্যন্ত প্রশস্ত একটা নূতন রাস্তায়। কতকগুলি অনর্থক এলোমেলো চিন্তায় সে এমনিই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে শারীরিক ক্লান্তি পর্য্যন্ত যেন অনুভব করিতে পারিতেছিল না। পা-দুইটা নিতান্তই অভ্যাসবশে চলিতেছিল।

কিন্তু এইভাবে চলিতে চলিতে সহসা তাহার গতিরোধ হইল। একটা গলির মোড়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের একজন রসিকতা করিয়া ডাকিল—বাবু শুনছেন!

অন্যমনস্ক ভাবেই দাঁড়াইয়া বীরেশ্বর একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা রূঢ় আঘাত লাগিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কতকগুলি নীচ-জাতিয়া স্ত্রীলোক মুখে খড়ি মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে কামোন্মাদ পুরুষের আশায়। তাহাদের কুৎসিত দেহ, বিশ্রী প্রসাধন, বিড়ি ও সস্তার এসেন্সের গন্ধ মিলিয়া এমন একটা আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল যে সেদিকে চাহিবামাত্রই তাহার গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করিয়া উঠিল। সে তাহাতাড়ি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল—

কিন্তু একটুখানি যাইবার পরই আবার তাহাকে থামিতে হইল। একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে একটি মাত্র মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রসাধন ও বেশভূষার দিকে চাহিবামাত্র বোঝা যায় যে সে-ও পূর্ব্বোক্ত দলেরই একজন, কিন্তু তবু তাহার মধ্যে কোথায় একটা স্বতন্ত্রতা ছিল যাহা বীরেশ্বরেরও চোখে পড়িল। তাহার হাতে বিড়ি নাই, চোখে জোর

করিয়া জাগানো লালসার দৃষ্টি নাই, সে যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবেই শূন্য রাজপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা বীরেশ্বর দাঁড়াইয়া পড়িতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—বাবু ঘরে যাবেন ?

ঘরে ?···মন্দ কি ?

বীরেশ্বর হাতের ঘড়িটায় দেখিল রাত বারোটা বাজে, মেসে পৌছিতে পৌছিতে ঝি-চাকরেরা পর্য্যন্ত শুইয়া পড়িবে। তাহার চেয়ে এইখানেই রাতটা কাটাইয়া গেলে কেমন হয় !

কী একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্যের সুর তখন তাহার মনে বাজিতেছিল, মনে হইল, তাহার কখনও কাহারও উপর ঘৃণা ছিল না, এখনও নাই ; তাহার কাছে মেসের বিছানা আর গণিকালয়ের বহু-জন-ভোগ্য শয্যায় কোনও তফাত নাই ; পথ ও গণিকালয় সব সমান।

সে অকস্মাৎ মন স্থির করিয়া ফেলিল, কহিল, চল যাচ্ছি, কিন্তু বেশী পয়সাকড়ি নেই আমার কাছে। একটা টাকা দিতে পারি—

মেয়েটি যেন একটু বিস্মিত হইল, তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল, তাই দেবেন। আসুন—

পাশের সরু গলিটার মধ্যে একটুখানি গিয়াই একটা একতলা মাঠ-কোঠা। সদর দরজা তখনও খোলাই ছিল, দ্বারের পাশে একটা কুলুঙ্গীর ভিতর কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল, মেয়েটি সেটি তুলিয়া বীরেশ্বরের পাশ কাটাইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। সেই শব্দে ভিতরের একটা ঘর হইতে তন্দ্রাজড়িত মোটা গলায় কে প্রশ্ন করিল—কে রে, বিনি এলি ?

বিনি জবাব দিল—হ্যাঁ মাসী, আমি।

তারপর সামনেই একটা ঘরের তালা খুলিয়া কহিল—আসুন।

বীরেশ্বর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল। ছোট ঘর, এক পাশে একটা তক্তপোষের উপর অতি পরিপাটি শয্যা এবং

একপাশে একটা জলচৌকীতে কতকগুলি বাসন ও পানের সরঞ্জাম, তাকের উপর কতকগুলি কাঁচের বাসন, গ্লাস ও রান্নার বাসন ; এই মাত্র আসবাব —কিন্তু সমস্তগুলিই ঝক্ ঝক্ করিতেছে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, সে ঘরে বসিতে মোটেই ঘৃণা বোধ হয় না। ঘরের মেঝেও চক্‌চকে, তেল পিছ্‌লাইয়া পড়ে।

একপাশে পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জলিতেছিল, একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া ডিবাটা নিভাইয়া দিল ; তারপর বীরেশ্বরের দিকে ফিরিয়া কহিল, বসুন। বিছানার যে পাশটায় ঘরের একটি মাত্র জানালা, বীরেশ্বর সেইখানটায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিনি মেঝেতে বসিয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া জুতাটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল, খাবার টাবার আনাতে হবে বাবু?

বীরেশ্বর কহিল, না, তুমি খেতে চাও তো আনাতে পারো—

বিনি কথার জবাব দিল না ; সে বীরেশ্বরের ধরণ দেখিয়া কী যে বলিবে তাহা বুঝিতেও পারিতেছিল না। বীরেশ্বর তখন তাহাকে দেখিতেছিল। শ্যামবর্ণ, নিতান্ত সাধারণ চেহারা, বয়স বোধ হয় তেইশ চব্বিশই হইবে, কিম্বা আরো বেশী। তাহার দৃষ্টিতে একটু বিচলিত হইয়া বিনি কহিল, জামাটা খুলুন—

বীরেশ্বর কহিল, থাক্‌গে জামা, আমি শোবনা এখন। আমার এখানে ঘুমও হবেনা! তারপর কথাটা মনে পড়িয়া গেল, কহিল, তুমি শুয়ে পড়তে পারো ; আমার কিছু দরকার নেই।···আমি মেসে থাকি, ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। মেসে ফিরতে ইচ্ছে নেই তাই রাতটা কাটাবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছি। তোমাকে আমার দরকার নেই—

বিনির চোখে সুগভীর বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বীরেশ্বর কহিল—তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি বরং টাকাটা আগেই নিয়ে নিতে পারো।

বিনি লজ্জিত হইয়া কহিল, না না টাকা এখন থাক্—

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরে মুখের রং ধুইয়া আসিয়া সে একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝেতে বসিল।

বীরেশ্বর জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি শুলে না?

বিনি জবাব দিল, আমার ঘুম পাচ্ছে না এখন—

সহসা ছাদের দিকে দেখাইয়া বীরেশ্বর কহিল, ওটা কেন?

'ওটা' অর্থাৎ ছেলের দোলনা।—চালের কাছাকাছি একটা বাঁশে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, গেল বছর এক বাবুর কাছে প্রায় মাস-ছয়েক ছিলুম। সেই সময়ে একটি ছেলে হয় আমার—

সে ছেলে কৈ?

বিনি আঙুল দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, বাড়ীও'লা মাসির ঘরে রাত্তিরে থাকে; ছোট ছেলে কাঁদে, সেই জন্যে বাবুরা ঘরে বসতে চায় না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া যেন কতকটা ভয়ে-ভয়েই কহিল, নিয়ে আসব বাবু, তাকে এ ঘরে?

বীরেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিনি লাফাইয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর মিনিট-খানেক পরে কাঁথা-বালিসসুদ্ধ মাস-ছয়েকের একটি ছেলেকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছেলেটি তখনও ঘুমাইতেছিল। ঘুমন্ত ছেলেকে প্রদীপের আলোর কাছে ধরিয়া কহিল, দেখুন না বাবু—

ছেলেটি মন্দ নয়, বেশ ফুট্‌ফুটে।

বীরেশ্বর কহিল, বেশ দেখতে—

বিনি একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তাহাকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। ঘুমন্ত ছেলে কাঁদিয়া উঠিতেই তাহাকে

চাপড় মারিয়া শান্ত করিয়া মেঝেতে বিছানাসুদ্ধ নামাইয়া রাখিল। তাহার পর আবার বীরেশ্বরের চৌকীর নীচে আসিয়া বসিল।

বীরেশ্বর কহিল, তুমি শোবে না ?

না বাবু, আমার ঘুম পাচ্ছে না।

বীরেশ্বর হাসিয়া কহিল—আমাকে ভয় করছে, না ?

মাথা নাড়িয়া বিনি কহিল, আগে করেছিল, এখন আর নেই ; সত্যি বাবু, সত্যি কথাই বলছি !

বীরেশ্বর কহিল, তবে ঘুমোচ্ছ না কেন ?

সে মাটির দিকে চাহিল, আপনার সঙ্গে একটু কথাই বলিনা !··· তাছাড়া জ্যোছনা রাতে, বিশেষ ক'রে এই নতুন হাওয়ার সময় আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না, আমি এম্‌নিই অনেকদিন জেগে কাটাই, সারারাত !

বীরেশ্বর একটা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া কহিল, অনেক হেঁটেছি আজ শুধু-শুধু, আমার ঘুম পাবারই কথা, কিন্তু নতুন জায়গা ব'লেই বোধ হয় ঘুম আসছে না !

বিনি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, পা-টা টিপে দেব বাবু একটু ?

পা—? আচ্ছা দাও—

বিনি বিছানায় বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল। একটু পরে বীরেশ্বর কহিল, আচ্ছা, তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ?

বিনি একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, আমাদের বাড়ী ? বাড়ী কোথায় পাবো বাবু ? ভাড়াটে ঘরেই চিরকাল—

বীরেশ্বর কহিল—না, না, সে বাড়ীর কথা বলিনি।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিনি নতমুখে জবাব দিল,—বাড়ী আমাদের পথেপথেই বাবু ; আমি এই সব ঘরেই জন্মেছি।

বীরেশ্বর লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। একটু পরে বিনি কহিল—আপনি ঘুমোলেন ?

বীরেশ্বর জবাব দিল, না। আচ্ছা বিনি, তোমার এসব ভালো লাগে ?

বিনি কহিল, ভালো মন্দ তো কোনও দিন ভাবিনি ; এই ঘরেই মানুষ হয়েছি, এই ঘরেই জন্ম, এই কাজই শিখেছি ; এছাড়া আর গতি কি বলুন ? তবে—

তবে কি ? বলো—

বিনি কহিল, মাঝে মাঝে এক একদিন কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই। আজকেই, যেন মনে হচ্ছিল খোকাকেও ফেলে কোথাও চলে যাই—

বীরেশ্বর সহসা উঠিয়া বসিয়া কহিল—আচ্ছা, যদি কোনও আশ্রমে তোমার ব্যবস্থা ক'রে দিই তো তুমি এসব ছাড়তে রাজী আছ ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনি কহিল, না সে আমি পারব না বাবু। এইখানেই জন্ম আমার, এইখানেই একদিন শেষ হবে। তা ছাড়া টাকা এখন জমাতেই হবে, নইলে খোকাকে মানুষ করব কি ক'রে ?

বীরেশ্বর আর কথা কহিল না। জানলাটা দিয়া দম্‌কা দক্ষিণের বাতাস আসিয়া ঘরের মধ্যকার প্রদীপশিখাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল।···

খানিকটা পরে ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, বিনি নামিয়া গিয়া ছেলের পাশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা হাত খোকার গায়ে। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল আকাশে চন্দ্র নাই, নক্ষত্রের আলোও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ ভোরের আর বেশী দেরি নাই। সে পকেট হইতে

একটা টাকা বাহির করিয়া বিনির মাথার কাছে রাখিল, তারপর জুতাটা পায়ে দিয়া যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে ভোরের হাওয়ায় আসিয়া তাহার যেন মনে হইল, বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নকে সে পিছনে ফেলিয়া আসিল—

বিনি তখন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল কে জানে!

প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটা আত্মোপান্ত পড়িয়া ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিলেন, তারপর তুইটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, আজ এই তুটো টাকাই নিয়ে যান, আসছে হপ্তায় আর কিছু দেব এখন।

নির্ম্মল হাত তুটি জোড় করিয়া কহিল, দেখুন মারা যাবো, অন্তত আর তুটো টাকা দিতেই হবে।

প্রকাশক তাঁহার অতি স্থূল দেহ চেয়ারে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া দিয়া কহিলেন—কোথা পাব টাকা? বেচাকেনা নেই, একটি পয়সা আয় নেই, এখন ঐ তুটো টাকা দিতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। আজ আর কিছু হবে না! আসবেন তখন, দিন-পাঁচ-সাত পরে—

নির্ম্মল আরও কি বলিতে যাইতেছিল, প্রকাশক বাধা দিয়া কহিলেন, এ বাজারে বই ছাপা মানেই তো টাকা জলে দেওয়া, ছাপতে যা খরচ হয় তার অর্দ্ধেকও ওঠে না। তার ওপর অত জুলুম করলে পেরে উঠব কেন?

নির্ম্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠার বই লিখিয়া দিয়া দশটি টাকা পাওয়া যাইবে—তাহাও এমনি করিয়া আদায় করিতে হয়।

মনে পড়িল আজ ম্যানেজারকে নিশ্চয়ই কিছু টাকা দিবে, কথা দিয়াছে। মেসে ঢুকিয়াই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে, অথচ তুটি টাকাই বা দেওয়া যায় কি করিয়া? যৌনবিজ্ঞানের উপর এই বইটি লিখিতে তাহাকে পনেরো-রাত্রি জাগিতে হইয়াছে—তাহার ফল এই!

ভাদ্রের খর-রৌদ্র মাথায় করিয়া মেসে ফিরিল। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী—তাহারই মধ্যে সস্তা দরের একটা মেস, নীচের ঘরগুলা যেমন অন্ধকার তেমনই তুর্গন্ধ, অব্যবহার্য্য। সুতরাং

দোতালার ঘরগুলিতে চার-পাঁচটি করিয়া সিট ফেলিয়া খরচের সঙ্কুলান করিতে হয়।

বিছানার চাদরটা ময়লা এবং ছেঁড়া বালিসের সমস্ত তুলাই বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহাতে মাথা দেওয়া বিড়ম্বনা। তক্তপোষ আর ছেঁড়া চাদরের মধ্যে একটা সস্তা দরের বিলাতী কম্বল ছাড়া আর কিছুই নাই। তক্তপোষটাও নড়িলে চড়িলেই কঁ্যাচ-কোঁচ করিয়া নিজের অক্ষমতা ঘোষণা করে।

সাহিত্যিক বলিয়া এই কেরাণীদের মেসে তাহার একটু প্রতিপত্তি ছিল ; তাই ঘরের একটি মাত্র জানলার যতটা সম্ভব কাছের সিট্‌টাই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া নিজের বিছানাতে বসিতেই ম্যানেজার আসিয়া দেখা দিলেন—এত দেরি হ'ল মশাই ?

নির্ম্মল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, প্রকাশকের কাছে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

ম্যানেজার আর বৃথা ভূমিকা না করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িলেন, টাকা পয়সা কিছু দেবেন নাকি ?

নির্ম্মল তুটি টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া ম্যানেজারের হাতে দিয়া বলিল, এই নিয়েই সন্তুষ্ট হ'তে হবে আজকে—এর বেশী পাওয়া গেল না।

ম্যানেজাব লোক খুব খারাপ ন'ন, বিশেষ সাহিত্যিকের উপর শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। তিনি কহিলেন, এতক্ষণ বসিযে রেখে মোটে তু'টি টাকা দিলে, তারা মানুষ না চামার মশাই ?···যাক্ উঠে নেয়ে খেয়ে নিন। ঠাকুর এখনও ভাত নিয়ে বসে আছে।

নির্ম্মল উঠিয়া একমাত্র জামাটি খুলিয়া ছেঁড়া গামছাটি লইয়া কলতলার দিকে চলিয়া গেল। জামা সে রঙিন দেখিয়াই কিনিত—একটা জামা একেবারে না ছিঁড়িয়া গেলে তো আর একটা কেনা সম্ভব হইত না। সুতরাং কাচাইবার প্রয়োজন না হয়, এমন জামা কেনাই ভালো। কাপড় খান-তুই

করিয়া থাকিত—কোনও রকমে তাহা সাবান দিয়া মাঝে মাঝে ফরসা করার চেষ্টা হইত!

সাহিত্য তাহার বাল্যের স্বপ্ন, যৌবনের সাধনা। তাই সে জীবিকার অন্য কোনও পথ কখনও খোঁজে নাই। ইহার জন্য পিতামাতা ঢের গঞ্জনা দিয়াছেন কিন্তু সে বরাবর তাঁহাদের এই জবাব দিয়াছে, বই লিখিয়া, সে অন্ততঃ তাঁহাদের স্বচ্ছলভাবে চলিবার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিতে পারিবে।

হায়রে! স্বচ্ছলভাবে চলা তো দূরে থাক্, আজ সে মেসের খরচ চালাইয়া বাড়ীতে দশটা টাকাও সব মাসে পাঠাইতে পারে না। অথচ বাড়ীতে মা, ছোট ভাই ও বিধবা বোন, তিন-তিনটি পোষ্য।

প্রথমে সে এক দৈনিকের অফিসে পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকুরী একটা পাইয়াছিল। বেলা দুইটা হইতে রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু সে চাকুরীও টিকিল না, পরিচালক সমিতির অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁহারা জবাব দিলেন।

তারপর কত জায়গায় কত চেষ্টা করিয়াছে কোথাও কোনও কাজ পায় নাই। ···বছর খানেক ঘোরাঘুরির পরে কোন সাপ্তাহিক কাগজের অফিসে একটা কাজ পাইয়াছিল, গত তিন বৎসর তাহাই চলিতেছে। পনেরো টাকা মাহিনা,—যাবতীয় লেখা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি সব কাজ তাহাকেই করিতে হয়। তাহার উপর মাঝে মাঝে বিল-তাগাদা ফাউ আছে।

ঐ কাজটি আছে তবু রক্ষা। এদিকে তো বিশেষ কোনও সুবিধা হয় নাই। সে গল্প লিখিত কিন্তু—বড় কাগজওয়ালারা ছোট লেখকের গল্প ছাপে না। ছোট কাগজওয়ালারা গল্প ছাপে বটে, টাকা দেয় না।

সুতরাং উপরির মধ্যে প্রকাশকদের ফরমাস্ খাটা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কেহ হয়ত একখানি উপন্যাস লিখিয়া দিতে বলিলেন, দশ টাকা কি পনেরো টাকা বড় জোর কুড়ি টাকা দিবেন। অবশ্য প্রকাশকের

নিজের নামে কিম্বা অপর কোনও বেনামে প্রকাশিত হইবে। যশটাও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে পাইতে দেন না।

কাহারও হয়ত গালাগালি দিয়া বই লিখাইতে হইবে—কাহারও বা কেচ্ছা ছাপা দরকার, দশ পনেরো টাকায় লিখাইতে চান, সুতরাং বড় দরের সাহিত্যিকদেব কাছে ঘেঁষিতে পারেন না, নির্ম্মলের মত অভাবগ্রস্ত ছাড়া তাঁহাদের গতি কি?

তাই কি টাকাটা সব একসঙ্গে পাওয়া যায়? যিনি খুব ভদ্রলোক তিনি পাঁচ-ছয় মাসে দশ টাকা শোধ করেন। অধিকাংশ লোকের কাছেই দশ টাকা আদায় করিতে বছর কাটে—কিম্বা অন্য কোনও রকমে আদায় করিতে হয়।

আহারেব পর্ব্ব সহজেই চুকিয়া গেল। ঠাণ্ডা ভাতের সহিত কলাইয়ের দাল, কচুর তরকারী ও এক টুক্‌রা মাছ যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি খাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে এতক্ষণ চোখে পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া দেখিল, মা লিখিয়াছেন, ছোট ভায়ের অসুখ, ক'টা টাকা না পাঠাইলেই নয়।

বিছানায় পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। গত মাসে বাড়ীতে এক পয়সাও পাঠাইতে পারে নাই বলিয়া এ মাসে মাহিনার পনেরো টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফলে মেসের টাকা দিতে পারে নাই। আজ প্রথম দু'টি টাকা দেওয়া হইল। এখন আবার বাড়ীতে টাকা সে পাঠায় কি করিয়া?···

বিশ্রাম করা হইল না। আবার ঘর্ম্মসিক্ত জামাটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের রৌদ্রে আত্মসমর্পণ করাই তাহার ভাগ্য; ভাবিয়া কি হইবে।

একজন প্রকাশকের কাছে কিছু পাওনা ছিল। তিনি নির্ম্মলকে দেখিয়াই কাঁদুনী গাহিতে শুরু করিলেন, সারাদিন এক পয়সা বিক্রি নেই মশাই, দোকান তুলে দিতে হবে দেখছি!

তবুও ভরসা করিয়া নির্ম্মল টাকার কথা তুলিল।

প্রকাশক চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, টাকার কথা তুলেছেন কি ক'রে মশাই, অবস্থা দেখছেন?

নির্ম্মল মিনতি করিয়া বলিল, অন্ততঃ দুটো টাকা দিন, বাড়ীতে বড় অসুখ।

দুটো পয়সা বিক্রী হয়নি। মাইরি বলছি!

অগত্যা নির্ম্মলকে উঠিতে হইল।

প্রকাশক পিছন হইতে কহিলেন, চললেন নাকি? একটু বসুন না! একটা প্রুফ ছিল। দেখে দেবার সময় হবে কি?

নির্ম্মল জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

আর এক জায়গায়—

প্রকাশক অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন আসুন নির্ম্মলবাবু!

নির্ম্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমার সেই ছেলেদের নাটকটার দরুন তিনটে টাকা পাওনা ছিল, আজ অনুগ্রহ ক'রে দিতে হবে।

প্রকাশক কহিলেন, এখন টাকা কি! সেই পূজোর আগে নেবেন।

নির্ম্মল বলিল, বড্ড দরকার। বাড়ীতে অসুখ, ক'টা টাকা না পাঠালেই নয়, আজকে আমায় দিতেই হবে।

অসুখের কথা আর বলবেন না, আমার বাড়ীসুদ্ধ সব পড়েছে, যেন হাসপাতাল!

নির্ম্মল কহিল, ও তিনটে টাকা আমায় দিয়ে দিন। বড্ড উপকার করা হবে।

প্রকাশক কহিলেন, আজ তো অসম্ভব, বরং আসছে সপ্তাহে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।

নির্ম্মল কহিল, দেখুন না, অন্তত দুটো টাকা যদি হয়—

ক্ষেপেছেন ? ক্যাশে আট গণ্ডা পয়সা পড়ে পাছে।...

পাশেই আর একজনের কাছে ছয় মাস আগের পাওনা।

তিনি নির্ম্মলকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আসুন, কি খবর ?

আজ্ঞে আমার সেই টাকা ক'টা! দেখুন অনেকদিন হ'ল।

তিনি কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ পাবেন বৈকি। আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। রাত্রে ফেরবার সময় আসবেন।

যে সাপ্তাহিকের আফিসে সে কাজ করিত সেখানে আজ কাজ আছে। আর দেরি করা যায় না দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে সেইখানে চলিয়া গেল।

আগের দিন যতটা কপি দিয়া আসিয়াছে তাহার প্রুফ দেখা, বাকীটা লিখিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ সারিয়া উঠিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তি। তিনি সম্মুখেই বসিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে তাহার চোখের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

তিনি মাথা তুলিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, কি খবর নির্ম্মলবাবুর ?

নির্ম্মলবাবু মাথা চুলকাইয়া কহিল, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ছোট ভায়ের বড় অসুখ। গোটা কতক টাকা যদি এ্যাডভান্স করেন তো বড়ই উপকার করা হয়।

সম্পাদক কহিলেন, আপনার বারো মাসই অভাব মশাই। আপনার তাগাদার জ্বালায় দেখছি এবার অন্য লোক দেখতে হবে।

কথা নির্ম্মলের গলায় ভয়ে আটকাইয়া গেল! সে মুখ শুকাইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল।

যে প্রকাশকটি রাত্রে আসিতে বলিয়াছিলেন তাঁহার দোকানে গেল।

কর্ম্মচারী কহিলেন, ওঃ, তাঁকে খুঁজছেন ? তিনি তো আজকের মাদ্রাজ মেলে ওয়াল্‌টেয়ার চ'লে গেলেন।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবেন ?

তা মাসখানেক হবে।

বাহিরে আসিয়া ফুটপাথে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর ধীরে ধীরে বাসার দিকেই চলিতে শুরু করিল। ছোট ভায়ের রোগক্লিষ্ট মুখ মনে পড়িয়া বার বার তাহার দুই চোখে জল আসিতে লাগিল।

সহসা চমক ভাঙ্গিল পিঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া, ফিরিয়া দেখিল হরিমোহন বাবু। ভদ্রলোকের দোকান নাই। তবে বাড়ীতে বসিয়া বই প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বেও ইঁহাকে খান-দুই বই সে লিখিয়া দিয়াছে।

তিনি কহিলেন, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।

নির্ম্মল কহিল, কেন বলুন দেখি ?

পূজোর আগে ছেলেদের জন্য একটা শিকারের বই বার করতে চাই। লিখে দিতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি ?

নির্ম্মল প্রশ্ন করিল, কার নামে বেরোবে ? আর আমি কি দেখেই বা লিখব ? কখনও তো শিকারে যাইনি।

হরিমোহনবাবু কহিলেন, বেরোবে কমলপুরের কুমার বাহাদুরের নামে, তিনি প্রায়ই শিকারে যান। কেউ সন্দেহ করবে না। আর লেখা ? সে আমি একটা ইংরাজী বই দিয়ে দেব এখন। বেমালুম বাংলা ক'রে দেবেন।

নির্ম্মল কহিল, কত দেবেন ?

তিনি মধুর হাসিয়া কহিলেন, এতদিন বাদে কি আপনার সঙ্গে দর করতে হবে ? যা পান, পনেরো টাকা ?

নির্ম্মল কহিল, দিতে পারি লিখে, টাকাটা কিন্তু আজই দিতে হবে!

টাকা? টাকা সেই পূজোর পরে।

নির্ম্মল দৃঢ় স্বরে কহিল, তা হ'লে পারব না। ভাই আমার ওষুধ-পথ্যির অভাবে মরতে বসেছে, আমার এখন ব্যাগার দেবার সময় নেই।

আহা হা, ভায়ের অসুখ করেছে নাকি? কি অসুখ,—কতদিন হ'ল? না বল্‌লে জানব কি ক'রে বলুন দেখি!

নির্ম্মল কহিল, এখন তো জানলেন। দেবেন টাকা কটা।

হরিমোহনবাবু কণ্ঠস্বর নামাইয়া যতদূর সম্ভব মিষ্টভাবে বলিলেন, অবস্থা তো জানেন, টাকা একটিও হাতে নেই। বই দিতে পারি খানকতক, বেচে যদি কোথাও থেকে টাকা পান্।

নির্ম্মল একটু ভাবিয়া বলিল, চলুন তাই দেবেন।

লিখিত দাম টাকা-বারোর মত বই তাহার হাতে দিয়া হরিমোহন কহিলেন, বারো টাকা দামের বই দিলুম, কমিশন বাদ দিয়ে দশ টাকাই পাবেন।

তখন ন'টা বাজিয়া গিযাছে। হরিমোহনবাবুর বাড়ী হইতে কর্ণওআলিস্ স্ট্রীট অনেক দূরে। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

একটি মাত্র দোকান তখন খোলা ছিল। সেখানে গিয়া প্রশ্ন করিল, মশাই এই বই ক'খানা রেখে কিছু টাকা দেবেন?

তাহারা নির্ম্মলকে চিনিত। কহিল, কত কমিশন বাদ দেবেন?

শতকরা পঁচিশ টাকা—

পঁচিশ টাকা তো ওরাই দেয় মশাই। আধা-আধি হ'লে নিতে পারি।

আরও খানিকটা টানাটানি করিয়া সাতটি টাকা পকেটে ফেলিয়া নির্ম্মল বাহিরে আসিল। ক্লান্ত দেহ আর চলিতে চায় না, তবু হাঁটিতে হইবে।

বাসায় তখন সকলে খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর মৃদু অনুযোগ করিল, তবু ভালমানুষ বলিয়া নির্ম্মলকে তাহারা ঢের দয়া করিত।

আবারও সেই ঠাণ্ডা ভাত। কোনও রকমে তুইটি মুখে দিয়া উপরে আসিয়া একা উঠিয়া গেল অন্ধকার ছাদে। একটু ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করা দরকার।

বহু রাত্রি পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা, বোনের কথা, ভায়ের কথা, আরও কত কি !

সহসা মনে হইল দূরে কে যেন গান গাহিতেছে—কান পাতিয়া শুনিল, রবীন্দ্রনাথের যে গানখানা সে খুব ভালবাসিত এটি সেই গান—

…আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া,
তোমার বীণা হ'তে এসেছে নামিয়া,
ভুবন ভেসে যায় স্থরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।'

সত্যই, এমন রাতে ছেলেবেলায় সে কত কবিতা লিখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতাগুলি এক সময় তাহার বোধ হয় মুখস্থ ছিল।

হয়ত আজও সে চেষ্টা করিলে কবিতা লিখিতে পারে। আজও গান শিখিবার ইচ্ছা মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। আজও ভাল-ভাল কথা মাথায় আসে, লিখিতে ইচ্ছা করে।…

গানের স্থরটা ফিরিয়া ফিরিয়া মনে কত ব্যাথার সঞ্চার করে।…

'এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে,
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে
গভীর কী আশায়, বিপুল পুলকে
তোমার পানে যাই তু'বাহু বাড়ায়ে—'

সে জোর করিয়া মন হইতে এ মোহ দূর করিয়া ফেলিল। শিকারের বইটা তুই দিনের মধ্যে শেষ করিয়া দিতে হইবে। রাত জাগিয়া লেখা প্রয়োজন, স্বপ্ন দেখিবার সময় কৈ ?

ফুলশয্যার ইতিহাস

একে-একে সকলে বাহির হইয়া গেলে রমেন দোরে খিল দিয়া আলোটা কমাইয়া বিছনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন মাথার বালিশের কাছে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু সে যে ঘুম নয়, তা তাহার দ্রুত-নিঃশ্বাসের শব্দেই বোঝা যায়।

শুভ্র শয্যার সর্ব্বত্র গোলাপের পাপ্‌ড়ি ছড়ানো, তাহারই মধ্যে ফুটন্ত গোলাপের মত দীপ্তির দেহখানি পড়িয়া আছে। 'পড়িয়া আছে' বলিলে ঠিক বোঝানো যায় না, অত্যন্ত নরম সিল্কের কাপড়ের মত তাহা এলাইয়া আছে।

দীপ্তির দেহখানি ক্ষীণ, কিন্তু সুগোল, সুডৌল এবং সুকুমার। সেদিকে চাহিবামাত্র মনে হয়, এ দেহ এতই নরম যে বোধহয় কাহারও হাতের ভরও সহিবে না।...এত সুকুমার দেহ ইতিপূর্ব্বে কাহারও দেখিয়াছে বলিয়া রমেনের মনে পড়িল না। ট্রেণে আসিবার পথে আগের দিন দুই একবার চুরি করিয়া রমেন তাহাব মুখটা দেখিয়া লইযাছিল, উপবাসক্লিষ্ট মলিন মুখের মধ্যে আয়ত দু'টি চক্ষুব লজ্জা-বিজড়িত চাহনির কথা মনে করিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন মোচ্‌ড়াইয়া উঠিল ; আজ সারাদিন সে কাজের-ভিতর একবারও ভাল করিয়া দীপ্তিকে দেখিতে পায় নাই সত্য কথা, কিন্তু গত-কল্যকার কটাক্ষের স্মৃতিতেই সে মস্‌গুল হইয়া আছে—সমস্ত কাজের মধ্যে সেই দু'টি চোখের কথা বার বার তাহাকে উন্মনা করিয়া দিয়াছে!

রমেন পকেট হইতে টর্চ্চটা বাহির করিয়া একবার দীপ্তির মুখখানি তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। দীপ্তি মুখ তুলিল বটে কিন্তু সে মুহূর্ত্ত-কয়েকের জন্য, তা-ও চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল না।

রমেন একটা ছোট্ট দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার তলার দিকে আসিয়া

বসিল। তাহার বয়স একটু বেশী হইয়াছে এ কথা আজ আর কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সকেও সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ এই যৌবনের প্রায় প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া ঐ ষোলো বছরের মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া কি সে ভুল করিল না? দীপ্তির বয়স যে ষোলোর বেশী নয় তাহার প্রমাণ সে আগেই পাইয়াছিল, আজ আরও নিঃসংশয় হইল সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, একেবারে ছেলেমানুষের মুখ!

রমেনের মনে পড়িল বন্ধুবান্ধবরা এই অসমান বিবাহে বাধা দিয়াছিল কিন্তু এই মেয়েটিকে সে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া কাহারও কথা শোনে নাই। আজ তাঁহার মনে মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল, সে কি পারিবে, দীপ্তির মনের মত হইতে? কিশোরীর প্রণয়-লীলার মধ্যে তাহাকে কি নিতান্ত বেমানান দেখাইবে না?

সে একবার চকিতের মধ্যে তাহার এই চৌত্রিশ বৎসরের জীবনযাত্রার দিকে চাহিয়া লইল। অতি শৈশবে তাহার মাথায় এক বিপুল সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অর্থ উপার্জ্জন এবং ভাই-বোনদের মানুষ করার চিন্তার মধ্যে সে আর কোনও দিকে নজর দিতে পারে নাই; মা এবং বোন ছাড়া অন্য কোনও রমণীর সঙ্গ বা সাহচর্য্যও তাহার অদৃষ্টে মিলে নাই। কোনও অভিজ্ঞতা, কোনও জ্ঞানই নাই তাহার এ বিষয়ে!·· যদি দীপ্তি তাহাকে ভালবাসিতে না পারে? যদি সে তাহাকে ভয় করে? তাহার সঙ্গ যদি পীড়াদায়ক বলিয়া মনে করে?

রমেনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে জোর করিয়া মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টায় দীপ্তির তনুলতার দিকে চাহিল। সুশ্রী, সুগঠিত তাহার চরণ দুটির কাছেই বসিয়াছিল—একবার তাহার পায়ে হাত বুলাইবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না। মাখনের মত নরম একখানি পা সে দুই মুঠার মধ্যে ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিল। মুহূর্ত্তখানেক স্থির

হইয়া থাকিয়াই দীপ্তি পা সরাইয়া লইল। বোধ হইল যেন চাপা হাসিতে তাহার পিঠটা বার দুই বেশী করিয়া ফুলিয়াও উঠিল, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ দিল না।...

রমেন জামাটা খুলিয়া বিছানাতে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর দীপ্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকিল, দীপু, দীপ্তি!

দীপ্তি তেমনিই চুপ করিয়া রহিল সাড়া দিল না।...

হাওড়া জেলার এক দুর্গম পল্লীর অতি গরীবের ঘরে তাহার জন্ম। তাহার জন্মের পরেই তাহার মা মারা যান এবং তাহার বাবার চাকরী যায়। সে চাকরী তিনি আর পান নাই। কোনও রকমে ছোট ভাইদের মন যোগাইয়া এবং ভাদ্রবৌ'দের সংসারে খাটিয়া তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন বটে কিন্তু সে থাকা যে মরার অধিক, এ কথা সে এই বয়সেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং সে ছেলেবেলা হইতেই সর্ব্বত্র শুনিয়াছে যে তাহার মত দুর্ভাগ্য আর নাই, নিজেও সে-কথা বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার চেয়ে যে সব মেয়েদের ভাল অবস্থা, যাহাদের সমস্ত শৈশব ও কৈশোর অবিরত লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া কাটে নাই, তাহারাও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কেহ মদ্যপের হাতে, কেহ বৃদ্ধের হাতে, কেহ বা অত্যাচারী লম্পটের হাতে পড়িয়াছে; তাহাদের দুর্দ্দশা সে নিজের চোখেই দেখিয়াছে এবং শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিয়াছে নিজের অদৃষ্টের কথা। কখনও ভাবিয়াছে যে তাড়াতাড়ি যাহা-হোক্ একটা হইয়া যাওয়া ভাল, বিবাহিত জীবনে তবু একটা স্বাধীনতা আছে; আবার ভাবিয়াছে যে বাপের বাড়ীতে লাঞ্ছনার মধ্যে দুঃখ আছে বটে, অপমান নাই, কিন্তু স্বামীর কাছে গিয়াও অদৃষ্টে যদি নির্য্যাতনই জোটে তো তাহার অপমান সে সহিবে কেমন করিয়া? তা-ছাড়া বাপের বাড়ীর দুঃখ একদিন শেষ হইবেই, এই আশায় সে প্রাণ ধরিয়া আছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক যে আজীবন!

এমন সময় একদিন কার্ত্তিকের মত রূপ এবং অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া রমেন

নিজে আসিল তাহাকে দেখিতে। সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। আগেই তাহার রূপ ও ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি সে শুনিয়াছিল ; মনে পড়িল, যে লোকটি মধ্যস্থ হইয়া এ সম্বন্ধ করে, জ্যাঠাইমা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন, কেন ও চেষ্টা করছ মিছিমিছি ? ও বাঁদ্‌রীর কি আছে যে পছন্দ করবে ? শুধু শুধু এ ধাষ্টামো কেন ?

তাহার উপর সেদিন তাহাকে সাজাইয়া দিবারও কেহ ছিল না, এমন কি কেহ তাহাকে একটা ভাল কাপড়ও পরাইয়া দেয় নাই। কী দুর্নিবার লজ্জার সহিত লড়াই করিতে করিতে যে সেই পুরাতন দেশী কাপড়টিতে দেহ ঢাকিয়া রমেনের সামনে তাহাকে যাইতে হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাহার অন্তর্য্যামীই জানেন। তাহার পর সে কেমন করিয়া দূরে, জামরুল গাছের আড়াল হইতে রমেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং কী গভীর বেদনায় সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়িয়াছিল, তাহা সে আজও ভোলে নাই। (চোখের জলে তুলসী-মঞ্চের মাটি ভিজাইয়া বার বার জানাইয়াছিল, হে ঠাকুর, যেন আমায় পছন্দ করে।)

কিন্তু তবুও যে সত্যই ভগবান তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন, তাহা যে কোনও দিনই আশা করে নাই। তাই যে দিন খবর আসিল যে রমেন তাহাকে পছন্দ করিয়াছে এবং এক কপর্দ্দকও না লইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন বাড়ীর অন্যান্য লোকের মত সে-ও সে কথা বিশ্বাস করে নাই! জ্যাঠাইমা এই সেদিন পর্য্যন্ত যখন বলিয়াছেন, 'ও তোকে ঠাট্টা করছে, তখন সে না মুখে, না মনে, কোনও প্রতিবাদই করিতে পারে নাই, শুধু গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অন্যের অজ্ঞাতসারে মুখে কাপড় গুঁজিয়া কাঁদিয়াছে।

তাহার পর শেষ পর্য্যন্ত সেই দিনটিও আসিয়া পড়িল, যেদিন আর কাহারও কোনও সংশয় রহিল না। কাকী ও জ্যাঠাইয়ের দলের হইল ঈর্ষা, কারণ তাহাদেরও বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল ; সুতরাং লাঞ্ছনার মাত্রা

সেদিক দিয়া বাড়িয়াই গেল। কিন্তু তা বাড়ুক, সে লাঞ্ছনা তখন আর তাহাকে বেদনা দিতে পারে নাই; বরং সে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছে। উপকথার রাজপুত্রের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তাহারও স্বামী আসিতেছেন, নিমেষে এই সব বেদনা সোনা হইয়া যাইবে। আজ যত দুঃখই আসুক, তাহাকে সে গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু কোথাও কোথাও তাহার আদরও বাড়িল। তাহার কাকার দুই মেয়ের আগেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এতদিন ভাল করিয়া দীপ্তির সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না, এইবার তাহারা দীপ্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। নিজেদের বিবাহিত জীবনের নানা গল্প তাহার কাছে করিয়া নানা উপদেশ দিয়া তাহাকে তৈরি করিতে লাগিল। মনে আছে, বিবাহের ঠিক আগের দিনই অনিলা তাহাকে বলিয়াছিল, দেখিস্ ছুঁড়ি, চট্ ক'রে যেন ভাতারের হাতে ধরা দিস্‌নি! তাহ'লে দাম কমে যাবে। অন্তত তিন চারদিন খেলিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা কইবি!

তাহার জবাবে অনুপমা বলিয়াছিল, হ্যাঁ, ধরা না দিয়ে পার পাবে কিনা! আজকালকার ছেলেরা পায়ে ধরে, কেঁদে, যেমন ক'রে হোক্ কথা কওয়াবেই। বাব্বা, আমাদের মানুষটি যা কাণ্ড করলে—সব প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল।

অনিলাও হাসিয়া বলিয়াছিল, তা—যা বলেছিস, যা বেহায়াগিরি করে—! মকর বলছিল যে ফুলশয্যার রাত্রিতে সে তার বরের সঙ্গে কথা কয়নি ব'লে শেষ পর্য্যন্ত বেচারা মাথা খুঁড়তে শুরু করেছিল, একেবারে রক্তগঙ্গা।

কথাটা শুনিয়া তাহার সারাদেহ আবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, সারারাত ঘুমাইতে পারে নাই! তাহার কথা, শুধু দু'টি মুখের কথা শুনিবার জন্য একটা পুরুষ মানুষ পায়ে ধরিতে পারে? এ-ও কি সম্ভব? ঐ সুন্দর পুরুষটি, যাহার জন্য সবাই তাহাকে ইতিমধ্যেই ঈর্ষা করিতে শুরু

করিয়াছে, যাহার বংশ এবং ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি আজ এ গ্রামের সকলের মুখে মুখে—সে-ও তাহার পায়ে ধরিবে, তাহার কাছে মিনতি জানাইবে, শুধু তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য ? তাহার সহিত কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইবে ?···

সে কিছুতেই এ সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ধারণা করিতে পারিল না, অথচ অবিশ্বাস করিতে গেলেও মনের ভিতরটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে ! এম্‌নি করিয়া আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোর রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল যে, সে অভিমান করিয়া একটা ঘরে বসিয়া আছে আর তাহার স্বামী রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটিতেছে।

বিবাহের দিনই বা কী লাঞ্ছনা তাহার ! 'গায়ে হলুদে'র তত্ত্বের বেনারসী কাপড়খানার মূল্য যখন তাহার বিশ্বনিন্দুক ন'কাকীমা পর্য্যন্ত অন্ততঃ একশ' টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, তখন আর কাহারও ঈর্ষা বাধা মানিল না। যত কিছু বাহ্য মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া সকলে একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু সে সব কোনও দিকে তাহার তখন মন ছিল না, তাহার অন্তরে সে কী এক অপরূপ সুর বাজিয়া চলিয়াছে, তাহাতেই সে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। ঐ অসংখ্য দামী শাড়ী, ঐ রকমারি জামা এবং বহুমূল্য সোনার হার আসিয়াছে শুধু তাহারই জন্য, একান্তভাবে ঐগুলি তাহারই !

শুভদৃষ্টির সময় সে তাই সকল লজ্জা ভুলিয়া চোখ মেলিয়া তাহার স্বামী, তাহার দয়িতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। রমেনের সৌম্য-সুন্দর মুখের দিকে, তাহারা সঙ্কোচ-ভরা কুন্ঠিত দৃষ্টির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল ; তাহার যত কিছু গ্লানি যেন নিমেষে ফুলের মালার মত রমণীয় হইয়া উঠিল। ছোটবেলায় সে শুমিয়াছিল, গৌরী মহাদেবকে পাইবার জন্য সহস্র বৎসর অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন ; তাহার মনে হইল যে সে এই মাত্র ষোলো বছরের কৃচ্ছ্রসাধনেই মহাদেবকে পাইয়াছে।

সে মনে মনে বার বার ভগবানকে বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর, যেন ভোগে হয়!

তারপর তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে আসা! শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ সকলের যত্নে ও স্নেহে গত চব্বিশঘণ্টা সময় যেন তাহার এক মধুর স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে! মনে হইল যেন সে সত্য সত্যই উপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে কোন্ এক কল্প-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আজ আর সে সংসারের সকলের অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা অনাবশ্যক ভার মাত্র নয়—আজ সে রাজেন্দ্রাণী! বহুলোকের সুখ-সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রী সে!

সব কথাগুলি মনে পড়িয়া একবার দীপ্তির সারা দেহ আনন্দে আশায় আবেশে, শিহরিয়া উঠিল। কোন্ এক পুলকানুভূতি তাহার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহের প্রতি অনুপরমাণুতে ছড়াইয়া ক্রমে দেহের অতীত যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। সে সুখ বেদনার মতই টন্ টন্ করিতে থাকে, সারা বিশ্বের বীণায় বেহাগ সুরে আঘাত করে!

রমেন অনেকক্ষণ পিছনে নিঃশব্দ বসিয়া থাকিয়া তাহার গায়ে আস্তে আস্তে একবার হাতখানা রাখিল। দেখিল সে কাঁপিতেছে; তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার ডাকিল, দীপু, তোমার শীত করছে? শালখানা গায়ে দিয়ে দেব?

দীপ্তি মুখ টিপিয়া হাসিল, সাড়া দিল না।

সে হাসি রমেন দেখিতে পাইল না। সে বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার পিঠে হাত দিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দেখিল ভীরু পাখীর মত তাহার বুক ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে! তাহার মন মমতায় ভরিয়া উঠিল। ভাবিল, ছেলেমানুষ! ভয় পাইয়াছে!

সে শালখানা খুলিয়া দীপ্তির গায়ে ঢাকা দিয়া দিল।

কিন্তু এত ভয়ই বা কেন? সে আজ পর্য্যন্ত যত বন্ধুবান্ধবদের ফুলশয্যার কথা শুনিয়াছে কোথাও তো এরূপ ভয়ের কথা শোনে নাই।

অধিকাংশ স্থলেই বরং শুনিয়াছে বধূরাই স্বামীর ভয় ভাঙ্গায়। এই তো কালই ইন্দু বলিতেছিল যে তাহার বউ ঘরে খিল দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে নাই, নিজেই আলাপ করিতে শুরু করিয়াছিল। তিন ঘণ্টায় সে এত কথা বলিয়াছিল যে বর্দ্ধমানের রাজার মহাভারতের মত একখানা সহস্র পৃষ্ঠার বই হয়!

তবে কি দীপ্তি তাহাকে পছন্দ করে নাই? না, তাহার বয়সের কথাটা কাহারও মুখে শুনিয়াছে? তাহার নামে কেহ নিন্দা করে নাই তো? রমেন রীতিমত নার্ভাস্ হইয়া উঠিল, আর একবার হেঁট হইয়া জোর করিয়া দীপ্তির মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, দীপু, একবার চোখ চেয়ে দেখ, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

দীপ্তি চোখ খুলিল না। কিন্তু মুখও ফিরাইল না। তখন রমেন মনে অনেকখানি বল আনিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল—বিবাহিত জীবনের প্রথম চুম্বন!

দীপ্তি এইবার মুখটা ফিরাইয়া লইয়া পুনরায় বালিশের তলায় মুখ গুঁজিল। বিবাহের পূর্ব্বেকার যত কিছু আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে যে আশা সে কল্পনাতেও মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ সে ধরিয়া লইয়াছে যে তা তাহার শুধু ন্যায্য প্রাপ্য মাত্র! সে অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলিল, এ আবার কি ঢং! এত ভয় কিসের?

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। পাশের ঘরের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। আর মাত্র ঘণ্টা দুই-তিন এ ঘরে থাকা চলিবে। রমেনও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। কিন্তু এই চুপ করিয়া শুইয়া থাকার রহস্য সে কিছুতেই ভেদ করিতে পারিল না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নিজের কোন অভিজ্ঞতাই তাহার নাই, বন্ধুবান্ধবরা যতটুকু বলিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই তাহার দৌড়; কিন্তু এরকম সম্ভাবনা তো কেহ তাহাকে বলিয়া

দেয় নাই? ...সে কি সত্যই এই ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া ভুল

আরও কিছুক্ষণ—

তারপর সে ভয়ে ভয়ে দীপ্তির পায়ে আর একবার হাত দিল, মিনিট-দুই নিঃশব্দে তাহার পা টিপিতে লাগিল। দীপ্তি বাধা দিল না, মনে মনে শুধু হাসিতে লাগিল, ভাবিল যে এইবার লক্ষণ মিলিতেছে—

রমেন তাহাকে এইবার জোর করিয়া নিজের দিকে ফিরাইল। দীপ্তির মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল; কিন্তু সে চুম্বন মরামানুষকে চুমা খাওয়ার মতই নিরর্থক বলিয়া মনে হইল। আর একটা মানুষ যদি নিতান্ত পাষাণের মতই পড়িয়া থাকে তো কেমন করিয়া তাহার কাছে প্রেম নিবেদন করা যায়।

সে ডাকিল, দীপু!

সাড়া নাই। পুনশ্চ কহিল, দীপু, আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমাকে কি তোমার ভয় করে?

দীপ্তি তাহার জবাবে আবারও পিছন ফিরিয়া শুইল। আসল কথা, তাহার হাসি পাইতেছিল। এই বুদ্ধি লইয়া লোকটা বিবাহ করিয়াছে? সে ধরা কিছুতেই দিবে না তাহা স্থির, কিন্তু এ লোকটা কি কোনও দিন জোর করিয়া তাহাকে কথা কহাইতে পারিবে?

রমেন একটু থামিয়া কহিল, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, সত্যি ক'রে বলো!

তবু ও পক্ষ হইতে সাড়া আসে না। রমেনের দেহে ঘাম দেখা দিল। কি বিপদ! এ কি বোবা নাকি?

সে রাগ করিয়া শুইয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুট স্বরে স্বগতোক্তি করিল, আমি ঘুমুই বাবা, কথা না কইলে তো বয়েই গেল!

কিন্তু সেটা কথার কথা! শুইয়া শুইয়া যেন শয্যাকণ্টকী বোধ হইতে

লাগিল। তাহার ষোল-সতেরটি বন্ধুর আজ পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু কৈ কাহারও অদৃষ্টে যে এরকমটি ঘটিয়াছে বলিয়া তো শোনা যায় নাই! তাহারই দুর্ভাগ্যক্রমে কি এই মেয়েটির যত কিছু বিপরীত আচরণ?

ওধারে দীপ্তিরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। পাশের ঘরের ঘড়িটা ক্রমাগত টিক্ টিক্ শব্দে মিনিটের পর মিনিট যেন দুই হাতে করিয়া সরাইয়া দিতেছে। তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিনটি কি এম্‌নি করিয়া নীরবে কাটিয়া যাইবে? রাত্রি প্রভাত হইতে আর দেরিই বা কি?···কিন্তু অনিলা অনুপমা, তাহাদের স্বামীরা পর্য্যন্ত পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কথা কওয়াইয়াছে, আর সে-ই বিনা আয়াসে ধরা দিবে! অথচ তাহার মত স্বামী-সৌভাগ্য আর কাহারও কি হইয়াছে?

রমেন ভাবিল বড় মেয়ে হইলেও না হয় রাগারাগি করা চলিত, কিন্তু এ যে একেবারে বালিকা, ইহাকে লইয়া কি করা যায়। সে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল কিন্তু দীপ্তির এই কঠিন নীরবতার কোনও কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। কারণ না জানিলে উপায় হয় কি করিয়া?

অনেকক্ষণ পরে সে শুইয়া শুইয়াই দীপ্তিকে নিজের কাছে জোর করিয়া টানিয়া আনিল, অকস্মাৎ তাহার মুখ, বুক, কণ্ঠ অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া তুলিল। দীপ্তি বাধা দিল না, সরিয়াও গেল না। অভিমানে তাহার চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছিল, মনে মনে সে বলিল, আমার দেহটার ওপরেই শুধু যদি তোমার লোভ হয়, তাই তুমি নাও, আমি চাই না কথা বলতে, চাই না তোমায় ভালবাস্‌তে।)

রমেনের সারা দেহ একাগ্র উত্তেজনায় তখন কাঁপিতেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে অকারণে তাহার হাতটা কঠিন মুঠার মধ্যে ধরিয়া নিপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই নিজের আচরণে লজ্জিত হইয়া দীপ্তিকে ছাড়িয়া দিল। এ কী করিতেছে সে, কাণ্ডজ্ঞান কি তাহার লোপ পাইল?

তাহার লজ্জাটা ক্রমে ক্রোধের আকার ধারণ করিল, ঐটুকু মেয়েরই বা এত কিসের জেদ? এত অহঙ্কার কেন? সে কি ভাবে রমেনকে বিবাহ করিয়া সে মাথা কিনিয়াছে? রমেন পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। থাক্ দীপ্তি তাহার অহঙ্কার লইয়া—সে আর সাধিবে না।

দীপ্তিও বুঝিতে পারিল না, কোথা দিয়া কি করিয়া এমনটা হইল। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। ধারায় ধারায় তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়া ফুলশয্যার নূতন বালিশ ভিজিতে লাগিল। এমনি করিয়া দু'টি নববিবাহিত নরনারী অন্তরের অগাধ আশা আকাঙ্খা কামনা বুকে করিয়া নীরবে পাশাপাশি শুইয়া রহিল। এবং তাহাদের সেই বেদনাকে উপহাস করিয়াই যেন ঘড়িটা অন্ধকারের মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করিতে লাগিল।

ভোরের আলো শার্ষির গায়ে লাগিতেই রমেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই ম্লান আলোতে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল—দীপ্তি কাঁদিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রাগ মন হইতে চলিয়া গিয়া সে জায়গায় পূর্ব্বেকার উদ্বেগ আসিয়া জুড়িয়া বসিল! সে ব্যাকুলভাবে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, দীপু, কি হয়েছে আমায় বলো, লক্ষ্মীটি! বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে? না আমারই কোন কাজে ব্যথা পেয়েছ। বলো লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।

দীপ্তির চোখের জল দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এই কথাগুলি এতক্ষণ কোথায় ছিল? এমন করিয়া আগে বলিলে তো তাহার ফুলশয্যার রাত্রি ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

রমেন তাহাকে খানিকটা তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমাকে এমন ক'রে কষ্ট দিয়ে তোমার লাভ কি হচ্ছে, দীপু?

এই তো! দীপ্তির বুক জ্বলিয়া উঠিল। অনিলা অনুপমার দল যাহা

বলিয়া দিয়াছে, এতক্ষণ পরে বুঝি তাহা মিলিতে চলিল। সে অধীর আগ্রহে অধিকতর মিনতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রমেন আবারও ভুল বুঝিল। সে রাগ করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীপ্তি কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া শুইয়া রহিল। কিছুতেই সে তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতে পারিল না। এমনি করিয়াই কি সারাজীবন অমৃতের পাত্র তাহার মুখের কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে? এ কি তাহারই সূচনা?···

সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া শুষ্ক মুখে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের পাণ্ডুর আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুর, একটিবার সে ফিরে আসুক, এবার নিজেই পায়ে ধরে তার কাছে মাপ চাইব।···

নীচের ঘরে বসিয়া তখন রমেনও ভাবিতেছে, অত রাগ না করিলেও চলিত। ছেলেমানুষ, আমারই উচিত ছিল, তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া ভয় ভাঙ্গানো।

বিশ্বদেবতা পূর্ব্বাকাশে বসিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অন্তরালবর্ত্তিনী

শেষ মুহূর্ত্তেও সত্য কথাটা তাহার মুখে আটকাইয়া গেল।

পূজার সময় সস্তা ভাড়া, সস্তা দুধ এবং সস্তা মুরগীর সুবিধা থাকায় সাঁওতাল পরগণার সমস্ত শহরগুলিই 'বাঙালী বাবু'তে ভর্ত্তি হইয়া গেছে। মধুপুরের তো কথাই নাই—কালীপুরের ফাঁকা দিকটাও মানুষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

খালি আছে মাত্র ডাক্তারবাবুর বাগানের প্রান্তের একটি বাড়ি; ছোট বাড়ি অথচ ভাড়া অত্যন্ত বেশী বলিয়াই এখনও খালি আছে, আর সেইটিরই খোঁজে নন্দ সেদিন সকালে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির বারান্দায় তখন মজলিস জোর চলিয়াছে; প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যাতেই এ আড্ডা বসে, চলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত। পাড়ায় যত অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী ডাক্তার প্রভৃতি প্রবীণরা আছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই এই আড্ডাতে হাজিরা দেন এবং জন্মান্তর হইতে শুরু করিয়া হিটলার পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েতেই সমান উৎসাহে আলোচনা চালাইয়া যান। সিগারেট, বিড়ি বা চুরুট সকলে নিজেরা লইয়া আসেন, যাঁহারা তামাক খান তাঁহাদের তামাক এবং চা— ডাক্তারবাবুর খরচ মাত্র এই দুটি।

এ হেন আড্ডাতে সেদিন নন্দ আসিয়া সসংকোচে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণের মত আলোচনা থামিয়া গেল। বক্তা সুরেশবাবু তখন পঞ্জিকার মতে যাত্রার দিন দেখা কত কঠিন সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, বাধা পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন; মুন্সেফবাবু শুধু ঈষৎ বিরক্ত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন, কী চাই আপনার?

নন্দ একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া জবাব দিল, ডাক্তার-বাবুকে খুঁজছি—

ডাক্তার বাবু কহিলেন, বলুন কি দরকার।

আঙ্গুল দিয়া বাড়িটা দেখাইয়া নন্দ কহিল, ঐ বাড়িটা শুনেছি এখনও খালি আছে, আমি ভাড়া নিতে চাই মাস-ছয়েকের জন্যে।

ডাক্তারবাবু ধীরে-সুস্থে মুখে কতকগুলি সুপারী পুরিয়া দিয়া কহিলেন, বেশ তো নিন্ না। কুড়ি টাকা ভাড়া; দুখানা ঘর আছে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বাথরুম—সব কম্প্লিট।

কথাটা সহজে মিটিবার নয় দেখিয়া সুরেশবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন, কী জন্যে নিচ্ছেন শুনতে পাই কি? হাওয়া খেতে আসছেন, না অসুখবিসুখ আছে।

নন্দ সবিনয়েই জবাব দিল, আজ্ঞে অসুখবিসুখ না হ'লে আর এখানে হাওয়া খেতে আসে কে বলুন? আর এক আসে বুড়ো হ'লে, যখন কিছু হজম হয় না—

মুন্সেফবাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কারণ তাঁহার বহু বৎসরের ডিস্‌পেপসিয়া। তিনি বেশ একটু উষ্ণভাবেই জবাব দিলেন, অসুখটা কি শুনতে পাই?

নন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, থাইসিস্। ঐ যাকে আজকাল টি-বি বলে—

নন্দর ঠিক কাছেই বসিয়াছিলেন অনুকূলবাবু, তিনি সভয়ে হাতখানেক সরিয়া বসিলেন। বাকী সকলেও যেন নিমেষে ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ, অবশেষে নন্দই পুনরায় কথা কহিল, আমার নয়, আমার স্ত্রীর—তাঁর জন্যেই।

ডাক্তারবাবু বার-দুই কাশিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার বাড়িতে ওসব বিশেষ সুবিধে হবে না। আমি ও রোগ রাখি না।

নন্দ হাসিয়া বলিল, ভাড়া যখন দিচ্ছেন তখন ওকথা বললে চলবে কেন বলুন। আমি স্বীকার করলুম তাই, না ব'লে নিলে কি ক'রে টের পেতেন? তাছাড়া আজকাল শতকরা দশটা লোকেরই ঐ রোগ—কত বাছবেন? এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদেরই যে কারুর আছে কিনা তাই বা কেমন ক'রে জানলেন, কিংবা তাঁদের বাড়িতে কারুর? সব সময়ে আবার বোঝাও যায় না—

সকলেই কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুরেশবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এ দুর্ভাবনা আপনার না করলেও চলবে আপাততঃ। আর কিছু বলবার আছে?

নন্দ কহিল, আর কি মশাই, এখনও একটা কথাই যে শেষ হ'লো না—

সে-ত উনি বললেনই, যে দিতে পারবেন না।

নন্দ হাসিল। কহিল, কিন্তু আমি তো এখনও বলি নি যে নিতে পারব না!

তাহার পর ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, দেখুন আশে-পাশের বাড়ির চেয়ে আপনার ভাড়া বেশী। সুতরাং আমরা চলে যাবার পর না হয় সব বাড়িটা ভাল ক'রে চূণ দিয়ে, দরজা-জানালাগুলোতেও রং দিয়ে নেবেন। কতই বা খরচা? না জানিয়ে কি আর এর আগে কেউও বাড়ি ভাড়া নেয় নি বলতে চান? তখনও তো ঐ কর্ম্মই করেছিলেন! আর এর পরের ভাড়াটেরা টের পাচ্ছে কি ক'রে?

ডাক্তারবাবুর শ্যামবর্ণ মুখ বেগুনি হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু নন্দ সে অবসর দিল না—পকেট হইতে খান দুই নোট বাহির করিয়া কহিল, আচ্ছা না হয় আর পাঁচ টাকা বেশীই নেবেন। এই নিন্, এই পনেরো টাকা এ্যাড্‌ভান্স দিয়ে গেলুম, বাড়িটা একটু ধুইয়ে রাখবেন। আমি বিকেলে এসে চাবিটা নিয়ে যাবো।

ডাক্তারবাবু আর আপত্তি করিবার অবসর পাইলেন না, কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই টাকাটা গ্রহণ করিলেন। শুধু কহিলেন, এখন কোথায় আছেন?

নন্দ কহিল, ঐ হোটেলটায়। বাড়ি ঠিক করতে একলাই এসেছি কিনা।—আজ চাবি নিয়ে রাত্রের গাড়ীতেই চলে যাবো, তারপর কাল কি পরশু ওঁকে নিয়ে—আচ্ছা, আসি নমস্কার!

সে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ধৃষ্টতা এবং তাচ্ছিল্যে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে স্থরেশবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু এটা কি করলেন ডাক্তারবাবু? জেনেশুনে পাড়ার মধ্যে একটা থাইসিস্ রুগী—

ডাক্তারবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, ঠিক পাড়ার মধ্যে তো নয়। আমার বাড়িটাই একটেরে, তার ওপর ওটা তো আবার আমার বাড়িরও শেষ কোণে। তাছাড়া ভদ্রলোক কথাটাও মিথ্যে বলেন নি, ওবাড়িটা প্রথম করবার সময়ই এক ভাড়াটে আসে ম্যালেরিয়া ব'লে, পরে জানতে পারি টি-বি!···বুঝলেন না! সেরকম হ'লেই বা করছি কি বলুন! এ-ত তবু পাঁচটা টাকা ক'রে বেশী পাওয়া গেল।···আর পড়েও আছে বাড়িটা—পূজোর সিজ্‌ন্ তো যায় যায়!···বুঝলেন না?

উপস্থিত সকলেই মুখটা বোদা করিয়া রহিলেন, খালি সায় দিলেন সান্যালমশাই, তাঁহার জামাইটি পুরীতে গিয়া সম্প্রতি এই বিভ্রাটেই পড়িয়াছে, রোগটা জানিতে পারায় কেহ বাড়ি দিতেছে না—

নন্দ সেইদিনই বাড়িতে নিজের তালা লাগাইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর একটা দিন বাদ দিয়া দ্বিতীয় দিনের দিন সকালেই দেখা গেল বাড়িটার জানালায় পর্দা ঝুলিতেছে এবং রান্না ঘরে ধোঁয়া। ভোর চারটায় যে ট্রেণটা আসিয়া পৌছয়, সম্ভবত সেইটাতেই উহারা

আসিয়াছে। সুরেশবাবু ভোর বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, অত সকালেই পর্দা ঝুলিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাহিড়ীমশাইকে কহিলেন, সাক্ষাৎ যমে ছুঁয়েছে, আর ক'দিন—তবু পর্দা দেখেছেন লাহিড়ীমশাই ? আব্রু দেখে আর বাঁচি না—

নন্দ উঁহাদের দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। সহাস্যমুখে নমস্কার করিয়া কহিল, আপনাদের আশ্রয়েই এসে পড়লুম। একটু দয়া রাখবেন—

অগত্যা সুরেশবাবুকে মিষ্টভাষণ করিতে হইল। কথা কহিতে কহিতে তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে তাহার ভাগ্যে দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না। নিটোল বলিষ্ঠ দেহ, স্বাস্থ্যে ও প্রাণের প্রাচুর্য্যে পূর্ণ—সে দিকে চাহিলে বৃদ্ধদের ঈর্ষাই হয়।···

সুরেশবাবু বোধ করি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা কানে গেল লাহিড়ীমশাই বলিতেছেন, এখানে তো হাওয়া খেতেই এসেছেন, তবে এসেই আগে পর্দা টাঙিয়েছেন কেন ? হাওয়া যত যায় ততই মঙ্গল, এখানকার হাওয়াতেই স্বাস্থ্য, বুঝলেন না ?

নন্দ ম্লান হাসিয়া কহিল, ভাগ্য আমার। আমার 'উনি'টি আবার এমন সেকেলে, বাইরে কিছুতে আসতে চান্‌না। কত বলি—কে কার কড়ি ধারে !

তাহার পর গলা খাটো করিয়া কহিল, আবার এ-ও ভাবি, আর কদিনই বা, সারবার রোগ তো নয়—যে কদিন বাঁচে নিজের ইচ্ছামতই চলুক, আমি আর টানাহেঁচড়া বিশেষ করি না।

শ্রোতা দুইজনেই যেন শিহরিয়া উঠিলেন। সুরেশবাবু হাত তুলিয়া কহিলেন, আচ্ছা নমস্কার ! চলুন, লাহিড়ীমশাই—

কিন্তু নন্দকে ঠেকানো গেল না। দিন-দুই যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে, তাস এবং দাবা, এই দুটিই সে ভাল খেলে এবং তাহার যত

মজলিসী লোক মেলা ভার। ইতিহাস ভাল জানা আছে, খবরের কাগজও নিত্য পড়ে সুতরাং রাজনীতিতে দ্রুত আলোচনা জমাইতে পারে, সরস কথাবার্ত্তার জন্য আলাপও জমে সহজে। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই মধুপুরের এই পাড়াতে তাহার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ হইল।

প্রথম প্রথম তাহার এতটা মেলামেশাতে দুই একজন, বিশেষত লাহিড়ীমশাই একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। হাজার হউক কঠিন রোগ লইয়া নাড়া-ঘাঁটা করে তো! ছোঁয়াচটা খারাপ যে। কিন্তু সুরেশবাবু এক কথাতে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন, থাইসিস্ তো আজকাল বলতে গেলে সব বাড়িতেই, তাদের বাড়ির লোকেরা পথে-মাঠে-বাসে-ট্রামে কোথায় নেই বলুন? তাদের পাশে কি আপনাকে বসতে হচ্ছে না?

সুতরাং সে আপত্তি টিকিল না। তাসের আড্ডার হোতা, মজলিসের তন্ত্রধারক এবং দাবার আড্ডার নায়ক হইয়া নন্দ ক্রমশ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। এমন কি ইহারই মধ্যে সুরেশবাবু, বাগ্‌চীবাবু, মুন্সেফবাবু এক-একবেলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াও দিলেন।

কিন্তু নন্দ যেমন অনায়াসে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাহার স্ত্রী তেমনি সুদূর হইয়া রহিল। কোনমতেই কোথাও বাহির হয় না, সকলে ঘুমাইলে সে নাকি গভীর রাত্রে পাশের মাঠটায় একটু পায়চারী করে। বেশী চলিতেও পারে না। শরীর তাহার খুবই খারাপ! চিকিৎসাও একরূপ বন্ধ; নন্দ বলে, কী হবে মিছিমিছি কতকগুলো টানাহেঁচড়া ক'রে বলুন! ওখানকার ডাক্তার একটা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দিয়েছে, সেইটে খাওয়াই আর দুধ খায় পাঁচপো-দেড়সের। ঐতেই যে কটা দিন বাঁচে! আর যা করে আপনাদের মধুপুরের হাওয়া।

এইভাবেই চলে। সহসা একদিন দেখা গেল আড্ডাতে নন্দ অনুপস্থিত। মুন্সেফবাবু অধৈর্য্য হইয়া লোক পাঠাইলেন, তাহার সহিত নন্দর দেখা হইল না, নন্দর যে বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী চাকর তাহাদের সহিত কলিকাতা হইতে

আসিয়াছে তাহারই মুখে খবর পাওয়া গেল মাইজীর অসুখ বাড়িয়াছে, বাবু এখন বাহির হইতে পারিবেন না।

সংবাদে সবাই ক্ষুণ্ণ হইলেন। আড্ডা যেন ভাল জমিল না। অনুকূলবাবু বলিলেন, ছোকরা ঐ বৌয়ের জন্যই ডুব্‌বে—

পরের দিনও নন্দ আসিল না, তাহার পরের দিনও না! খবর সেই একই, মাইজীর অসুখ বেশী, বাবু নড়িতে পারিতেছেন না।

দিন চার-পাঁচ পরে যখন নন্দ বাহিরে আসিল, তখন যেন তাহাকে আর চেনা যায় না, মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত—রাত্রি জাগরণ ও অনিয়মের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে। সুরেশবাবু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—ইস্‌ চেহারাটাকে কি ক'রে ফেলেছ হে?

নন্দ ম্লান হাসিয়া জবাব দিল, আর চেহারা! কদিন যা কেটেছে, একটি ঘণ্টাও পুরো ঘুমোতে পারিনি।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, কিন্তু এমন ক'রে শরীরের ওপর অত্যাচার করলে তো চলবে না, একে ঐ পাশে দুর্দ্দান্ত রোগ, দুর্ব্বল শরীর পেলেই চেপে ধরবে যে—

নন্দ কহিল বুঝি তো সব, কি করি বলুন—

অনুকূলবাবু কহিলেন, নার্স-টার্স একটা—কী অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন—

নন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে হবার যো নেই অনুকূলবাবু তাহ'লে আর ভাবনা কি! নার্সের হাতের জল উনি খাবেন না। ব'লে রেখেছেন, 'তার আগে তুমি নিজে হাতে আমার গলা টিপে দিও! সে-ও আমার সইবে।'···আর আত্মীয়স্বজন এ রোগে কে আসবে বলুন?···

তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না, ও আর কোন উপায় নেই। এ বোঝা আমাকেই বইতে হবে—

এই ঘটনার পরে পুরুষ মহলে যেমন অতিরিক্ত স্ত্রৈণ বলিয়া নন্দর বদনাম রটিয়া গেল, নারীমহল তেমনি ঐ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষটির প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিলেন। মুন্সেফবাবুর নাত্‌নী কমলা বেথুনে পড়ে, সে তো স্পষ্টই বলিল, এ সব স্বার্থত্যাগের ইতিহাস আর কে জানছে বলো, সাজাহান হ'লে লোকে কবিতা লিখত!

কমলার বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমন স্বামীর কোলে মরেও সুখ আছে!

তাঁহার স্বামী এখন কলিকাতায়, আট দিনেরও বেশী হইল কোন চিঠি পাওয়া যায় নাই—সুতরাং তাঁহার ক্ষোভটাই বেশী।

ইহার পর কমলা একদিন, প্রায় গায়ে পড়িয়াই, নন্দর সহিত আলাপ করিল এবং অপরাহ্নে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া অপটু নিজহস্তে নিম্‌কি ভাজিয়া খাওয়াইল। সুরেশবাবুর বিধবা বোন একেবারে অন্তঃপুরে বসাইয়া চিঁড়ার পায়স খাওয়াইলেন এবং বার বার মাথার দিব্য দিয়া দিলেন, তুমি বাবা দুধ একটু বেশী ক'রে খাও, নইলে শরীর একদম টিকবে না। চেহারা এই কদিনে একেবারে আদ্দেক হয়ে গেছে।

অর্থাৎ বিদেশের এই ক্ষুদ্র বাঙালী সমাজটিতে নন্দর প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। কিন্তু হপ্তাখানেক না যাইতে যাইতে আবার দেখা গেল নন্দ অনুপস্থিত। এবারে আর কাহাকেও খোঁজ লইতে হইল না, নন্দ নিজেই একটা চিরকুট লিখিয়া সুরেশবাবুর কাছে ছুটি লইল—'ওঁর আবার একটা টাল এসেছে। এখন বোধ হয় ক'দিন আর নড়তে পারবো না।'

মনের আবেগে ও অস্থিরতায় হাত কাঁপিয়াছে, নন্দর অমন সুন্দর হাতের লেখা চেনাই যায় না। সুরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ছোকরাকে ঐ রোগটি চেলে না দিয়ে আর মা-লক্ষ্মী যাবেন না দেখছি।

কমলা উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু কাকাবাবু, আপনি কি বলতে

চান যে রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে উচিত হ'তো? নারীর তাহ'লে এই মূল্য আপনাদের কাছে?

অপ্রস্তুত হইয়া সুরেশবাবু চুপ করিলেন।

কিন্তু এবারে যখন নন্দ বাহির হইয়া আসিল তখন তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন, চেহারা ঠিক অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। কৈফিয়ত-স্বরূপ নন্দ কহিল, আমার আবার এই ক'দিন যেন ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার মত হয়েছে, বোধ হয় রাত জেগেই, কিছু হজম হচ্ছে না!

কমলার বৌদি আড়াল হইতে চক্ষু মুছিলেন। নন্দ কহিল, যা ব্যাপার দেখছি, হয়ত ওঁকে নিয়ে আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে—। আর বেশী দিন নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। এমন শোকাবহ ব্যাপারে কীই-বা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। মুন্সেফবাবু কহিলেন শুধু, কিন্তু এখানকার এমন হাওয়া থেকে নিয়ে গেলে কি আরও খারাপ দাঁড়াবে না? বিশেষতঃ এই সামনে শীত, এখন আরও হাওয়া ভালো হবে।

অন্যমনস্কভাবে নন্দ কহিল, দেখি।

কিন্তু দিন-তিনেক পরেই আবার সে অদৃশ্য হইল। বাজারে চাকরের কাছে খবর লইয়া জানা গেল যে, এবারে অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। সকলেই ছোকরার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। অমন ছেলে, অমন স্বাস্থ্য, অমন মধুর স্বভাব—এক স্ত্রীর জন্য মাটি হইয়া গেল!

মেয়েরাও ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যা-নাগাদ কমলা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, কিন্তু এ কী অন্যায় দাদু, তোমরা সবাই লোকটিকে ভালবাসো, কিন্তু ওঁর এই উপর্যুপরি বিপদের খবর পেয়েও কেউ একবার তাঁর খবর নেওয়া কর্ত্তব্য মনে করো না! আশ্চর্য্য, তোমাদের ছেলেমেয়েদের যদি কিছু হয় তা হ'লে দেখছি তাদেরও খবর নেবে না?

মুন্সেফবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, না না, তা নয়। তবে খবর নিয়েই বা কি করব বল্, ওর বৌ পর্দ্দানশীন্, আমরা গেলেও তো কোন কাজে লাগব না!

সহসা কমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, তবে আমিই যাই একবার—

বাড়িসুদ্ধ সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, সে কি, তুই যাবি কোথায়? এই রাত্রি বেলা—

শান্ত কণ্ঠে কমলা জবাব দিল, কি হয়েছে তাতে? ভদ্রলোকের বিপদে ভদ্রলোকেই দেখে থাকে। ছোঁয়াচ লেগে যদি আমার অসুখ করেই তো আমাকে হাসপাতালে দিও—আমাকে নিয়ে কাউকে বিব্রত হ'তে হবে না।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, কিন্তু পরের বাড়ি এমন সময়ে—একটা লোক-লজ্জা তো আছে!

কমলা ততক্ষণে দালান পার হইয়াছে, সেইখান হইতেই জবাব দিল, তাঁর স্ত্রী তো আছেন, আর আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি—

ব্যাকুলভাবে কমলার মা বলিলেন, জানিনে বাবা তোমাদের ধিঙ্গিপনা! তা যাবো ব'লেই অমনি চললি? অন্ততঃ আর কাউকে দিই সঙ্গে। ও বুধিয়া!

কমলা বাধা দিয়া কহিল, থাক্ বুধিয়া। নিজেরা প্রাণের ভয়ে যে বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াও না, সেখানে চাকরকে পাঠাতে লজ্জা করে না? ···ওদের বুঝি প্রাণ নয়?···তা ছাড়া এই তো রাস্তাটা পেরিয়ে যাওয়া, এখনও আটটা বাজে নি। ভয়টাই বা কি?

সে আর দাঁড়াইল না। তর তর করিয়া বাগানটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িল এবং দ্রুত চলিয়া নন্দদের বাড়ির দুয়ারে উপস্থিত হইল। কড়া নাড়ার শব্দে বিস্মিত হইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল বৃদ্ধ চাকরটা, কিন্তু সামনে কমলাকে দেখিয়া সহসা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

কমলা কহিল, তোমার মাইজীকে দেখতে এসেছি—

সে পথ না ছাড়িয়াই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবাব দিল···মাইজীর বেমারি······বাবু······বড্ড বেমারি—

কমলা প্রায় ধমক দিয়াই কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। বেমারি ব'লেই তো দেখতে এসেছি। সরো, পথ ছাড়ো—

চাকরটাকে প্রায় ঠেলিয়াই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু প্রথম ঘরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য নজরে পড়িল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘরের মেঝেতে ব্যাগ প্রভৃতি ছড়ানো, সেখানে একটা যাত্রার আয়োজন চলিতেছিল, আর বিছানার উপর শুইয়া আছে নন্দ নিজেই। গায়ে একটা কম্বল চাপা, হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে মুখের যতটা দেখা যাইতেছে, তাহা রোগ-বিবর্ণ, নিরতিশয় পাণ্ডুর।

কমলার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া উহাকে দেখিতে পাইয়াই নন্দ তাড়াতাড়ি উঠিতে পারিল না, আবার শুইয়া পড়িয়া কহিল, আপনি যে হঠাৎ?

কমলা দ্বার-পথেই অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, এ কি, আপনারও অসুখ?····আপনার স্ত্রী কোথা? তাঁকে কে দেখছে?

নন্দ আঙুল দিয়া কোণের মাদুরটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটে পেতে বসুন। ওটা আজই গরম জলে কাচা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত ঐটেই নিরাপদ।

কমলা কহিল, কিন্তু—

নন্দ হাসিয়া জবাব দিল, বলছি। স্ত্রী আমার নেই। অসুখ আমারই।

কমলা আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে যে—

নন্দ কহিল, হ্যাঁ, স্ত্রীর কথাই বলেছি, তারও কারণ ছিল। সত্য কথাই বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু দেখলুম যা ওঁদের ভয়, জানতে পারলে আমাকে

আর ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে দেবেন না—সেই জন্যই কিছুতে শেষ পর্য্যন্ত ভরসা ক'রে বলতে পারলুম না। অথচ এই বিদেশে একা-একাই বা থাকি কি ক'রে বলুন দেখি! বাধ্য হয়েই মিথ্যাচরণ করতে হলো। রোগটা খারাপ ব'লে এত বড় ধাপ্পাটাও চলে গেল, শেষ পর্য্যন্তও যেতো, যদি সত্যি-সত্যিই দয়া আপনি আজ না করতেন।

কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। অনেকক্ষণ পরে কহিল, কিন্তু আপনার অমন চমৎকার হেল্‌থ্, অমন ফিজিক্—

নন্দ কহিল, ঐ ফিজিক্‌ই কাল হ'লো। এম-এ পাশ ক'রে ল' পড়বার সময় কী যে দুর্ম্মতি হ'ল, মনে হ'ল গায়ের জোরে আর চেহারার ফর্ম্মে সবাইকে হারিয়ে দিতে হবে। উঠে পড়ে লাগলুম ব্যায়াম করতে, রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে বারবেল চালাতে গিয়ে হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে এক ঝলক্ রক্ত উঠল। ডাক্তার বললে, একেবারে 'টি-বি'। মা-বাবা নেই; দাদা, বৌদি, ভাই-বোনেরা শোনামাত্র ভয়ে শিউরে উঠল। দেখলুম বাড়িতে থাক্‌লে মুখে জলও দেবে না কেউ।...কেবল এই বুড়ো চাকর, ও আমাকে ছাড়ে নি। তাই ওকে সম্বল ক'রেই একা বাড়ি থেকে ভেসে পড়লুম। মায়ের খান-কতক গয়না ছিল আমার কাছে, তাই বেচে হাজার খানেক টাকা হাতে ক'রে মধুপুরে এসেছিলুম। মনে আশা ছিল নিশ্চয়ই সারবে, ডাক্তাররা হয়ত অতটা বুঝতে পারে নি, তাঁরা বলেও দিলেন যে খুব খারাপ অবস্থা নয়।...ছিলুমও এখানে এসে ভালই, হঠাৎ কী হ'লো, আবার—

কমলা কহিল, আর রক্ত উঠেছে কি?

নন্দ কহিল, না রক্ত নয়! এমনি জ্বর চল্‌ছে, আর বুকে যন্ত্রণা। কদিন ক'রে চেপে ধরে যখন, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি, আবার একটু ছাড়া পেলেই বেরোই। ভেবেছিলুম জোর ক'রে রোগকে তাড়িয়ে দেবো। হয়ত দিতেও পারতুম, যদি না একটা চিন্তা মাথায় এসে ঢুকত। ডাক্তারেরা বলে, এ অবস্থায় ওসব কথা চিন্তা করতে নেই।...

কমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই ছিল। এইবার নন্দরই শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

নন্দ কহিল, এখানেই বসলেন।

কমলা কহিল, তা হোক্—। কিন্তু চিন্তাটা কি ?

নন্দ একটুখানি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। হয়ত যন্ত্রণা বাড়িয়াছে মনে করিয়া কমলা প্রশ্ন করিল, বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো ?

নন্দ কহিল, না।···জীবনে মেয়েদের দিকে তাকাবার সুযোগ কোনদিনই পাইনি। এখানে এসে একজনকে দেখে পর্য্যন্ত কেমন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকল, কেবলই মনে হ'তো, যদি ভাল থাকতুম তাহ'লে হয়ত তাকে পাবার আশা দুরাশা হ'তো না। এখনও যদি ভাল হই তাহ'লেও হয়ত—। সে যাক্—কিন্তু আপনি হঠাৎ কেন এলেন, বললেন না তো ?

কমলার মুখ সহসা রাঙা হইয়া উঠিল। সে জবাব দিল, সে কথাও যাক্। কিন্তু মালপত্তর এমন ছড়ানো কেন ?

নন্দ অপ্রতিভভাবে হাসিয়া জবাব দিল, অভিনয় যে আর বেশীদিন চলবে না তা বুঝতে পেরেছিলুম। তাই ভেবেছিলুম, আজই ফিরে যাবো—। এখানে ঐ মিথ্যার আবরণই রেখে যেতে চাই—

কমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, কিন্তু সেখানে কে দেখবে আপনাকে ? বাড়ির কথা তো ঐ বললেন—

নন্দ কহিল, এখানেই বা কে দেখতো বলুন।···সেখানে গিয়ে হাসপাতালে যাবো ভেবেছিলুম। পৈতৃক বাড়িটার ভাগ আছে, তা ছাড়া হাতেও কিছু টাকা আছে। হাসপাতালেই একটা ভালো ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া যাবে। বুবিয়া তো রইলই—

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজই যেতে চান ?···

নন্দ কহিল, হ্যাঁ, এই দশটার ট্রেণে। অন্ধকার থাকতে থাকতে সরে পড়াই ভালো—কেউ দেখতে পাবে না।

কমলা নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া কহিল, তাহ'লে তো আর বেশী দেরী নেই। আচ্ছা আমিই জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি—। বুধিয়াকে ·গাড়ি ডাকতে বলুন।

নন্দ কৃতজ্ঞকণ্ঠে কহিল, তাহ'লে তো বেঁচে যাই—

তাহার পর চাকরকে গাড়ি ডাকিতে বলিয়া কতকটা যেন আপন মনেই কহিল, ভগবান যাবার আগে তবু একবার মুখ তুলে চাইলেন—

কমলা কথা কহিল না। জিনিসপত্র সামান্যই, অল্প সময়ের মধ্যেই গোছানো শেষ হইয়া গেল। বাকী রহিল নন্দর বিছানাটা। কমলা কহিল, চলুন গাড়িতে গিয়ে বসবেন, বুধিয়া ঐ বিছানাটা বেঁধে নিক্—

নন্দ উঠিয়া বসিয়া বুধিয়াকে ডাকিতে যাইতেছিল, কমলা বাধা দিয়া কহিল, ও থাক্, আমিই ধরছি।

নন্দ আর কথা কহিল না। কমলার কাঁধেই সম্পূর্ণ ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়িতে উঠিল। বাক্সগুলি নীচে রাখিয়া, গোটা-দুই বালিশের সাহায্যে তাহাকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছন্দে বসাইয়া দিয়া কমলা কহিল, স্টেশনে বুধিয়া নামিয়ে নিতে পারবে তো ?

নন্দ বলিল, তা পারবে'খন।···আপনার এ দয়া যে আমি জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন ভুলতে পারব না, একথা আপনাকে জানানোও বাহুল্য।···কিন্তু এতক্ষণ আপনি রইলেন এখানে, তার জন্যে কোন কথা উঠবে না তো ?

কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। কেমন একটা বিকৃত ভারী গলায় জবাব দিল, সে দুর্নাম থেকে আপনার স্ত্রীই বাঁচাবেন আমাকে, তাঁর পরিচয় আমি ছাড়া আর কারুর জানবার দরকার কি ?

নন্দ একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

ততক্ষণে বুধিয়া মালপত্র লইয়া আসিয়াছে। কমলা শুধু দুটি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নিজের বাড়ির রাস্তা ধরিল।

সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

সহসা সেদিন ঘুম ভাঙিয়া অরুণের মনে হইল প্রভাতটি বড় সুন্দর। আদিগঙ্গার শীর্ণরেখার ওপারে গরুর গাড়ীর শ্রেণী, বোসেদের অতি প্রাচীন নারিকেল গাছের অল্প দুই একটি সবুজ পাতা, এমন কি, তাহার ঘরের সামনের রাস্তায় হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানদের বিবাদের শব্দ পর্য্যন্ত যেন তাহার সেদিন ভাল লাগিল। মনে হইল গতরাত্রের বিশ্রামের অবসরে তাহাদের যেন রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

তাহার এই মনোভাবের কারণ সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না—একটা দিন যে অন্ততঃ এই কুৎসিত, জরাজীর্ণ পৃথিবীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে ইহারই খুশীতে সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুখটা ধুইয়া আসিয়া, চা না খাইয়াই, সে কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া গেল গল্প লিখিতে। আজ সে গল্পই লিখিবে, কবিতা নয়, প্রবন্ধ নয়, ছেলেদের বই নয়—এই সুমধুর প্রভাতে সে অত্যন্ত মিষ্ট একটি গল্প লিখিবে।

অরুণ সাহিত্যিক। কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে যে সে এই পথ বাছিয়া লইয়াছিল তাহা বোধ করি সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজ তাহার ঐ জীবিকা, জীবনের পথ ঐ! একটি ছেলেদের মাসিকে সে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে, মাহিনা পায় মাসিক কুড়িটি টাকা। তাহাকেই লেখা ভিক্ষা করিতে হয়, প্রুফ দেখিতে হয়, আর্টিষ্টের বাড়ী গিয়া ছবি এবং ব্লকওয়ালার কাছে গিয়া ব্লকের তাগাদা করিতে হয় এবং আশানুরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া সম্পাদক-মালিকের নিকট হইতে তিরস্কার সহ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কাগজে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া সে আরও কিছু উপার্জ্জন করে। উঞ্ছবৃত্তি বলিবার কারণ এই যে ইহাদের নিকট হইতে সাহিত্যের মূল্য যেটুকু সে পায় তাহার

তিনগুণ তাহাকে বেগার দিতে হয়; তিনটি গল্প তিনটি বিভিন্ন কাগজে বিনামূল্যে দান করিয়া চতুর্থ গল্পটির জন্য হয়ত চার টাকা কিম্বা পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পায়; খবরের কাগজে রবিবারের সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিবার জন্য হয়ত টাকা পাওয়া যায়, অনেক সময়ে অগ্রিমও পায় কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে ঐ সকল দৈনিকের অফিসে প্রতিদিন দুপুরে ও সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে হয় এবং প্রায় প্রতিদিনই সম্পাদকের অনেকখানি কাজ যাচিয়া করিয়া আসিতে হয়। সবসুদ্ধ মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশটি টাকা উপার্জ্জন করিবার জন্য তাহাকে প্রতিদিনই রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটা-দেড়টা পর্য্যন্ত জাগিয়া গল্প লিখিতে হয়।

এক একদিন তাহার মনে হয় যে, প্রথম যৌবনে, যখন কলেজে পড়িত সেই সময়েই কাহারও হাতে পায়ে ধরিয়া যদি একটা কোন অফিসে চাকুরী যোগাড় করিয়া লইত তাহা হইলে আজ তাহার দিন কাটিত সুখে এবং রাত্রে পাইত বিশ্রাম। ছোট দুটি ভাইকে ভাল স্কুলে দেওয়া চলিত, বোনটার জন্য দিনরাত ভগবানের কাছে মাথায় ছোট করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইত না এবং মায়ের জন্য দাসী রাখাও চলিত, অন্ততঃ ঠিকা ঝি। আর, হয়ত বিবাহ করিবার ইচ্ছাও আজ তাহার একান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু তবু এখনও, আজিকার মত দুই-একটি মুহূর্ত্ত তাহার জীবনে আসে, যখন মনে হয় যে প্রাণপণে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিবার শক্তি তাহার এখনও যায় নাই, সাহিত্য সৃষ্টি সে এখনও সত্যই করিতে পারে। এখনও সে মধ্যে মধ্যে সেই দিনের স্বপ্ন দেখে, যেদিন তাহার সৃষ্ট সাহিত্য তাহাকে যশ ও অর্থ আনিয়া দিবে। সেই সব মুহূর্ত্তে যেটুকু শক্তি ও উদ্যম সংগ্রহ করে তাহাই সে প্রাণপণে ক্ষয় করিয়া চলে, সেই কল্পনারই একটা ছায়াকে কোথাও দাঁড় করাইয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত কলম চালাইয়া যায়, শ্রান্ত মন হইতে আত্মহত্যার চিন্তাকে দূরে রাখে।

যাক্ সে কথা—

অরুণ আজ গল্প লিখিতে বসিয়াছে। চমৎকার একটি গল্পের প্লট বহুদিন আগে পথ চলিতে চলিতে মাথায় আসিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অবসর হয় নাই; আজ আর তাহার সারাংশ কিছু মনে নাই, শুধু ছায়াটি আছে স্মৃতির পথে লাগিয়া। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সে দ্রুত কলম চালাইতে লাগিল। মধুর, সুন্দর একটি প্রেমের গল্প ছাড়া এমন আলো-ঝলমল অপরূপ প্রভাতে আর কিছুই লেখা যায় না! প্রেমের গল্পে তাহার সমবয়সী কোন সাহিত্যিকেরই নিষ্ঠা ছিল না, কিন্তু অরুণের প্রেমের গল্পের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস, তাহার ধারণা, যে প্রেম জগতে দুর্লভ, সেই প্রেমের গল্প ছাড়া মানুষ আর কিছুই স্মরণ রাখিতে চায় না।

গল্প যখন অর্দ্ধেকেরও বেশী অগ্রসর হইয়াছে, তখন রান্নাঘর হইতে মা আসিয়া দেখা দিলেন, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ কখন বেরোবি অরুণ?

অরুণের চমক ভাঙ্গিল, খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, যেমন সময়ে যাই, একটায়। কেন?

প্রশ্নটার সহজ জবাব না দিয়া তিনি পুনশ্চ নিজেই প্রশ্ন করিলেন, তোর মাইনে আজ দেবে ওরা?

অরুণ উত্তর দিল, দেবার কথা তো পরশু থেকেই ছিল, দেবে কি না কি জানি।

মা আরও একটু নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, গয়লাটা বড্ড তাগাদা করছে। গত মাসে নিরুর অসুখের সময়ে যে দুধ নেওয়া হয়েছিল তারও দাম দিতে পারিনি কিনা! এ মাসেও অনেক দিন হয়ে গেল, ওরই বা অপরাধ কি? কিন্তু আমার হাতে একটি পয়সা নেই, আজ মোটে দু' আনার বেশী বাজার হয়নি।

অরুণ জানিত যে তাহার মা সহজে পয়সাকড়ির কথা তাহার কানে তোলেন না, ব্যাপার নিশ্চয়ই আজ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, গয়লা কি দুধ বন্ধ করবে বলেছে ?

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বন্ধ ক'রে আর কি করবে, চা খাওয়া তো ? না হয় না-ই খেলুম। কিন্তু বড় চেঁচামেচি করে—

তিনি আরও খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্না ঘরে চলিয়া গেলেন। অরুণও একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গল্পের প্যাডটি একটা বই চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। গল্প লিখিলে আর চলিবে না—রচনা-বিন্যাসের আর সময় নাই। তাহার মনিবের মাহিনার উপর শ্রদ্ধা ছিল না, হয়ত তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেও দিতে পারিবেন না, সুতরাং আরও একটা কিছু অমোঘ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে একখানা বিলাতী বই টানিয়া লইয়া দৈনিক কাগজের জন্য একটা জোরালো প্রবন্ধ লিখিতে বসিল।

কিন্তু প্রবন্ধে তাহার মন বসিল না। মধ্য-আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতির গৃহস্থালীর বিবরণ লিখিতে লিখিতে কেবলই তাহার মনে হইতেছিল বেচারী মাধুরী, তাহার নায়িকার কথা। সকালে যে সুরটি তাহার মনে জাগিয়াছিল, তাহারই রেশ মনে থাকিতে থাকিতে গল্পটা শেষ করিলে ভাল হইত। কিন্তু উপায় কি ?···

প্রবন্ধটি শেষ করিয়া যখন সে উঠিল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কালীঘাট হইতে কলেজ স্ট্রীট, এই দীর্ঘ পথ তাহাকে প্রায়ই হাঁটিয়া যাইতে হয়, কদাচিৎ কোনদিন দম্‌কা টাকা পকেটে আসিয়া পড়িলে সে বাসে চড়ে! যাহা হউক, অফিসে যখন পৌঁছিল তখন দুইটা বাজিয়া দশ মিনিট, তাড়াতাড়ি গিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাগজের মালিক পাশের ঘরে বসিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন শুনিতে পাইল কিন্তু প্রেসের লোকেরা এখনই প্রুফের জন্য ভীষণ তাগাদা দিবে বলিয়া তখনই আর সেখানে যাওয়া চলিল

না, প্রুফ দেখিতে শুরু করিল। গোটা-চারেক নাগাদ হাতটা একটু খালি হইতেই পাশের ঘরে গিয়া দেখিল ঘর খালি। কেরাণীকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, বাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন ;—বিশেষ কাজে শ্রীরামপুর যাইতে হইবে, সুতরাং আজ আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবর্ণ মুখে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাইনেব চেকটা কি রেখে গেছেন ?

কেরাণী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কৈ না। আমাকে কিছু বলেও যান্‌নি তো!

অরুণ বুঝিল যে এখানে অপেক্ষা করা বৃথা, তখনই সে বাহির হইয়া পড়িল। হেড্‌ কম্পোজিটার শ্যামবাবু প্রশ্ন করিলেন, আরও তিনটে গ্যালি বাকী রইল যে—

অরুণ সংক্ষেপে কহিল, থাক্—

শ্যামবাবু পিছনে পিছনে আসিয়া কহিলেন, বড্ড অসুবিধে হবে কিন্তু, কোন কাজ শেষ করতে পারব না।

অরুণ রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, অসুবিধা হ'লে বাবুকে ব'লো, জবাব যা দিতে হয় তাঁকেই দেব।

ততক্ষণে সে রাস্তায় পা দিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে তাহার মাথা যখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল তখন সে বুঝিল যে অতটা মেজাজ দেখাইয়া কোন লাভ হইল না, বরং কিছু লোকসানের সম্ভাবনা আছে। এই বাজারে যদি এ-চাকরীটি যায় তো তাহার পরে কি হইবে, এক মুহূর্ত্ত কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। তবে শ্যামবাবু সে ধরণের লোক নয়—এই যা ভরসা!···

যে দৈনিকের অফিসে সে উপস্থিত হইল, ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নগদ বিদায় করে। কিন্তু, তাহার বন্ধু, সহকারী সম্পাদক জিতেনবাবু তাহাকে

দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ইস্ অরুণ বাবু, আর যদি পাঁচটা মিনিট আগে আস্‌তেন!

সে বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন বলুন তো?

জিতেনবাবু তাহার পকেটের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওটা কি? প্রবন্ধ তো?···ননীবাবু একটু আগেই আপনার কাছে লেখা চাইবার কথা বলছিলেন। আর একটু আগে এসে পৌছলে নগদ বিদায় হ'য়ে যেত—

অরুণ বুকের ভিতর যেন একটা হিম শৈত্য অনুভব করিল। কহিল, তিনি কি নেই?

না, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন!

ননীবাবু মালিক, ম্যানেজার—সব। তাঁহার হুকুম না হইলে টাকা পাইবার উপায় নাই, তাহা সে জানিত। সুতরাং ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, তিনি ফিরবেন তো এখানে?

জিতেনবাবু পাশের টেবিলের অভয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ননীবাবু কি আজ ফিরবেন?

অভয়বাবু জবাব দিলেন, কি জানি, কিছুই ব'লে যান নি। ফেরেন তো সাতটার মধ্যেই ফিরবেন।

অরুণ অগত্যা একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। জিতেনবাবু তাহার জন্য এক পেয়ালা চা আনিবার হুকুম দিয়া কহিলেন, অরুণবাবু একটা কাজ করতে পারেন? জার্ম্মানরা তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে মস্ত বড় বড় কথা বলেছে, শুনেছেন তো? তাই নিয়ে স্টেট্‌সম্যান আজ আবার একটা লিডার দিয়েছে। আমাদেরও তো কিছু বলা দরকার! লিখুন না বেশ সরস একটা প্রবন্ধ, ঐটেই এডিটোরিয়াল চালিয়ে দিই—

অগত্যা সে কাগজ-কলম লইয়া বসিল। জিতেনবাবুর অনুগ্রহে আরও

এক কাপ চা খাইয়া যখন সে প্রবন্ধটি শেষ করিয়া দিল তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ননীবাবু?

জিতেনবাবু বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ আর তাঁর ফেরবার কোন আশা আছে ব'লে মনে হয় না। আপনি বরং প্রবন্ধটা রেখে যান—কাল আমি দামটা চেয়ে রেখে দেবো।

অরুণ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, আজ রেখে যেতে পারব না। যদি অন্য কোথাও নগদ দাম পাই তো দিয়ে দেবো, আজ আমার বিশেষ দরকার।

জিতেনবাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই তো! আমার কাছে একটাও টাকা নেই, নইলে আমিই দিয়ে লেখাটা আটকে রাখতুম!

অরুণ আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর যে একটি মাত্র বাংলা দৈনিকে গল্প বা প্রবন্ধের বিনিময়ে টাকা পাইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে পৌঁছিয়া যদি টাকা না পায় তো ফিরিয়া আসিতে ন'টা বাজিয়া যাইবে। ততক্ষণে বইয়ের দোকান একটাও খোলা থাকিবে না। সুতরাং সে আগেই প্রকাশকদের কাছে ঘুরিয়া যাইবার সংকল্প করিল। প্রকাশকদের মধ্যে অনেকে তাহাকে চেনেন, তাঁহারা সকলেই সমাদর করিয়া বসাইলেন। এক-এক পেয়ালা চা'ও সকলে খাওয়াইলেন কিন্তু ছয় সাত কাপ চা খাইয়া যখন তাহার মাথা ঘুরিতে শুরু হইল, তখনও টাকার কোন ব্যবস্থা হইল না।

বিরক্ত হইয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল সাহিত্য না করিয়া ছেলে পড়াইলে নিয়মিত কিছু টাকা পাওয়া যাইত। কিন্তু সে সব চিন্তা বৃথা, লালদীঘির মোড়ে অপর কাগজের অফিসে যত শীঘ্র পৌঁছিতে পারে ততই সুবিধা, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিল। তবুও, অফিসে সে যখন পৌঁছিল তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুই

প্রধান সহকারী সম্পাদক, এখানে তাহার খাতির আছে—যদিচ পয়সা-প্রাপ্তিযোগ এখানে দুর্লভ।

তাহার সব কথা শুনিয়া গিরিজা জবাব দিল, কিন্তু ক্যাশ তো ছ'টায় বন্ধ হয় জানিস! এখন আর কোন উপায় নেই।

অরুণ শুষ্কমুখে কহিল, তোর কাছে নেই? অন্ততঃ দুটো টাকা? লেখাটা না হয় রেখেই যাচ্ছি—

গিরিজা কহিল, ক্ষেপেছিস্? গত মাসের মাইনে আজও পাইনি। কম্পোজিটররা টাকা না পেলে কাগজ বন্ধ করবে ব'লে তাদের মাইনে আগে দেওয়া হয়েছে।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরিজা কহিল, দাঁড়া, চা খেয়ে যা—

ম্লান হাসি হাসিয়া অরুণ কহিল, চা থাক্। বিকেল থেকে এত কাপ চা খেয়েছি যে চায়ের বদলে দু' পয়সা হিসেবে তার দামগুলো পেলে আমার কাল বাজার খরচাও বাঁচত, শরীরটাও ভাল থাকত।···

বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইবে প্রথমটা যেন স্থির করিতে পারিল না। শেষকালে বাড়ীর পথই ধরিল। গোয়ালা কালও গালি দিবে, কিন্তু উপায় কি? সাহিত্য যাহার পেশা, গোয়ালার অপমানকে ভয় করিলে চলিবে কেন?···

সে বাড়ীর দিকেই চলিয়াছিল, সহসা তাহার মনে হইল শ্যামবাজারের কাছাকাছি এক প্রেসের মালিক তাহার নিকট হইতে তাঁহার ছেলেদের মাসিকের জন্য একটি লেখা চাহিয়াছিলেন; হয়ত—

সে আবার শ্যামবাজারের পথ ধরিল—জুতার গোড়ালী ক্ষইয়া গিয়াছে বহুদিন, সেই জুতা পরিয়া হাঁটাহাঁটির ফলে পা দুইটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তথাপি সে বাসে চড়িতে সাহস করিল না; আবার সমস্ত পথটা হাঁটিয়া রাত্রি এগারটা নাগাদ প্রেসের দুয়ারে ঘা দিল। মালিক জাগিয়াই ছিলেন,

নামিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই অরুণ কহিল, আপনি আমার কাছে একটা গল্প চেয়েছিলেন। তার জন্যে টাকা দেবেন তো?

মালিক ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, টাকা?

অরুণ কহিল, হ্যাঁ, অন্ততঃ কিছু চাই। তিন টাকা, চার টাকা—যা হয়! অমনি দেবো না।

মালিক কহিলেন, লেখা এনেছেন?

অরুণ জবাব দিল, আজ যদি টাকা দেন তো কাল বারোটার মধ্যে পৌঁছে দেব।

মালিক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া জবাব দিলেন, তারপর আর এ ধারের ফুটপাথই হয়ত মাড়াবেন না। আগাম টাকা নিলে আপনাদের লেখা দিতে ভারী কষ্ট হয়।

অরুণ কহিল, আমাদের হয় কিন্তু আমার হয় না। আমার অভাব সবার চেয়ে বেশী।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া—বোধ করি লেখার প্রয়োজন তাঁহার খুবই বেশী ছিল—তিনি বলিলেন, কাল সকাল সাতটার সময়ে যদি লেখা পৌঁছে দিতে রাজী থাকেন তাহ'লে এখন দুটি টাকা আপনাকে দিতে পারি, বাকী দু'টাকা কাল সকালে নিয়ে যাবেন।

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া অরুণ কহিল, বেশ তাই দিন।

যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। মা আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া পুনশ্চ শুইয়া পড়িলেন। ভাত ঢাকা দেওয়াই থাকে, কারণ তাহার বাড়ী ফিরিতে প্রত্যহই মধ্য-রাত্রি হয়।

অত্যধিক চা পানে মাথা ঘুরিতেছে, পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত, তবুও আহারের পর কাগজ কলম লইয়া সে বসিল হ্যারিকেনের সামনে। ছেলেদের গল্পটি আজ রাত্রের মধ্যে শেষ না করিলে কাল সকালে দেওয়া

যাইবে না! কিন্তু গল্প কোথায়? মিনিট দশেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পরও কোনরকমের লেখা তাহার মাথায় আসিল না। অথচ চোখ ক্রমশ বুজিয়া আসিতেছে ভিতর দিকে—

সহসা তাহার চোখ পড়িল সকালের অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পটার দিকে। সেটা টানিয়া পড়িতে শুরু করিবার পর তাহার মনে হইল যে এই গল্পটা যতটা লেখা হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে দুইটি প্যারা বাদ দিয়া আর যদি, গুটি-তিনেক প্যারা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে ইহাকেই ছেলেদের গল্প বলিয়া চালানো যায়!

প্রভাতের স্বপ্ন সন্ধ্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুমধুর প্রেমের গল্প লেখার কোনও মূল্যই চোখে পড়ে না এখন। সে দৃঢ়হস্তে কলম ধরিয়া মিনিট-দশেকের মধ্যেই গল্পটির রূপান্তর কার্য্য শেষ করিল।

আলোটা নিভাইয়া শুইয়া পড়িল বটে কিন্তু বহুক্ষণ ঘুম আসিল না। খোলা জানলাটার মধ্য দিয়া যতটুকু আকাশটা দেখা যায় সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল যেন নক্ষত্রদল নীরবে তাহার দিকে উপহাসের দৃষ্টি মেলিয়া আছে।

সে জানলাটা বন্ধ করিয়া দিল।

দূরের পরশ

মালতীর চিঠি আসিয়াছে। এইমাত্র পিওন বিলি করিয়া গেল।

নীলরঙের মোটা কাগজের পুরু খাম, দেখিলেই যেন মালতীর চিত্ত ভরিয়া উঠে, মনে হয় কত অজানা আনন্দই না বহন করিয়া আনিয়াছে খামখানা! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিটা খুলিতেই ইচ্ছা করে না তাহার, শুধু খামখানা হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয়, খুলিলেই সমস্ত সম্ভাবনাটা শেষ হইয়া যাইবে, আনন্দটা আর অভাবিত থাকিবে না। ললিত যে এই বড় খাম ব্যবহার করে তাহার জন্যই মালতী কৃতজ্ঞ। তাহার মেজদির বর যেন কি, বরাবরই সরকারী খামে চিঠি লেখে, আবার বলে, মিছামিছি খামের পয়সাটা খরচা করিয়া লাভ কি?

মালতীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র তুই মাস, গত বৈশাখের ষোলই—দিনটা চিরকাল মালতীর মনে থাকিবে। ললিতের মত স্বামীই সে চিরদিন কল্পনা করিয়াছে, কামনা করিয়াছে—রূপবান, স্বাস্থ্যবান, ভদ্র! সেই স্বপ্ন তাহার স্বার্থক হইয়াছে বৈশাখের ঐ তারিখটিতে;—স্মরণীয় বৈকি দিনটা!

কিন্তু বেচারী মালতী! বিবাহের পর এগারোটি দিন মাত্র সে স্বামীকে পাইয়াছে, বিবাহের আট দিন শ্বশুর বাড়ীতে এবং এখানে জোড়ে আসিয়া তিন দিন। তাও তিন রাত্রি নয়—এগারো দিনের দিনই সে চলিয়া গিয়াছে, এখান হইতে সোজা তাহার কর্ম্মস্থলে, সুদূর বিহারের পাটনা শহরে! তাহার পর হইতে এই চিঠিই একমাত্র ভরসা তাহার। একদিন অন্তর একখানি নীল খাম পাটনা শহর হইতে তাহার স্বামীর বার্ত্তা বহন করিয়া আসিয়া হাজির হয়। কোনদিন বা দীর্ঘ, কোনদিন বা সংক্ষিপ্ত, অফিসের কাজের তাড়া যেদিন থাকে সেদিন আর ললিত বড় করিয়া চিঠি লিখিতে পারে না; কিন্তু ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, প্রতিদিনই নতুন নতুন

কথা লেখে সে—এত কথা কোথায় পায় ললিত, কে জানে! মালতী কত চেষ্টা করে কিন্তু লিখিবার মত বেশী কথা মনে পড়ে না তাহার, ফলে মালতীর প্রত্যেক চিঠিই হয় ছোট, সে জন্য আবার ললিত কত অনুযোগ করে।

খামখানা বাবা ডাকিয়া হাতে দিলেন। প্রতিদিন তিনিই ডাকিয়া দেন। সকালে বাহিরে বসিয়া চা খাইবার সময় পিওন তাঁহার হতেই দিয়া যায়। তিনি চা খাওয়া শেষ করিয়া হাসি-হাসি মুখে ভিতরে আসিয়া ডাকেন, আমার মালু-মা কৈ গো; চিঠি আছে!

মালতীর বড় লজ্জা করে কিন্তু—রোজই তাঁহার হাতে চিঠি পড়ে, কী মনে করেন তিনি, কে জানে। তাঁহার ঐ হাসিটা বিশেষ করিয়া—! আজও সেই হাসি তাঁহার মুখে, মালুমা তোমার চিঠি নাও।

মালতী কোনমতে খামখানা তাঁহার হাত হইতে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল একদম তেতালার ছাদে। এখানে বড় একটা কেহ আসে না, নির্জ্জনে চিঠি পড়িবার পক্ষে এইটিই নিরাপদ স্থান। সে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর পাঁচিলের সামান্য ছায়ায় বসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু তখনই সে চিঠিটা বাহির করিল না। কোন দিনই করে না, সে চিঠিখানা খুলিবার আগে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে ললিত কি-কি লিখিয়াছে। নানা কথা ভাবে সে, দু-তিন রকম চিঠি সে মনে মনে ভাঁজিয়া রাখে, তাহার পর চিঠি খুলিয়া দেখে তাহার কল্পনার সঙ্গে মেলে কিনা। এইটাই তাহার খেলা, জুয়া খেলার আনন্দের মত একটা তীব্র নেশা অনুভব করে সে। প্রায়ই চিঠি তাহার কল্পনার সহিত মেলে না, আরও নূতন কথা, প্রেম নিবেদনের নূতন পদ্ধতি থাকে তাহার মধ্যে—কিন্তু তাহাতেই মালতীর আনন্দ হয় বেশী।

আজও সে অনেক্ষণ বসিয়া বসিয়া নানা কল্পনা করিল। তাহার পর

কৌতূহল যখন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল তখন সে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। নীল রঙেরই পুরু কাগজ, চমৎকার লাইন টানা—আর তাহারই উপর মুক্তার মত ললিতের সুন্দর হাতের লেখা। মালতীর বুক আশু আনন্দের সম্ভাবনাতে কাঁপিয়া উঠিল, রোজই এমনি ওঠে, ললিতের হাতের লেখা দেখিলেই তাহার এমনি হয়।

আজ কিন্তু চিঠিটা বড়ই ছোট। একখানি মাত্র কাগজের এক পিঠে আঠারো-উনিশ লাইন লেখা। সেজন্য ললিত ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছে; লিখিয়াছে, "মধুমালতী গো, আজ আফিস থেকে বেরিয়েছিই রাত ন'টার পর। এমন খাটুনী গেছে আজ, তা আর বলবার নয়। এসে স্নান ক'রেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, ঘুমে যেন চোখ জুড়ে আসছে। আজ বোধহয় খাওয়াও হবে না, চিঠি শেষ ক'রেই শুয়ে পড়ব। কাজেই চিঠি ছোট হ'লো ব'লে কিছু মনে ক'রোনা।—"

মালতীর মন বেদনায় ভরিয়া গেল। আহা বেচারী! সাহেবটা যেন কি, এত খাটায় কেন বাপু। একটু সকাল করিয়া ছাড়িলে কি হয়? এই খাটুনী, তাহার উপর খাওয়া-দাওয়ার এই অনিয়ম, শরীর টিঁকিবে কেন?

কিন্তু গর্ব্বও বড় কম হইল না তাহার। সারাদিনের পর বরং খাওয়াটাও ললিত বাদ দিতে পারে, কিন্তু চিঠি লেখা বন্ধ করিতে পারে না! বিবাহের পর হইতে এই দুই মাসে একদিনও তাহার চিঠি লেখার বেনিয়ম হয় নাই। ঠিক একদিন অন্তর তাহার চিঠি আসে—

মালতী আবার চিঠিটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। চিঠির ভাঁজের একটা দিক কি করিয়া জলে ভিজিয়া গিয়াছে, ফলে অনেকগুলি অক্ষরই হইয়া উঠিয়াছে অস্পষ্ট। তা হোক,—তবু পড়া যায়।···

কিন্তু কিসে ভিজিল কে জানে! জলে পড়িয়াছে? না, তাহা হইলে

আরও ভিজিয়া যাইত, সমস্ত কালি লেপিয়া চুপ্‌সাইয়া একেবারে একাকার হইয়া যাইত, কিছুই পড়া যাইত না। তবে ?···

হঠাৎ মালতীর একটা কথা মনে পড়িল। ঠিক হইয়াছে, চিঠি লিখিয়া ললিত নিশ্চয় তাহার জামার বুক পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পর অফিসে আসিয়াও কাজের ভীড়ে অনেকক্ষণ চিঠি ফেলিবার কথা তাহার মনে ছিল না, গরমের দিন, ঘামে গেঞ্জি-জামা ভিজিয়া উঠিয়াছে, চিঠিটাও ভিজিয়াছে সেই সঙ্গে! জলের ভিজা এত সামান্য হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া চারভাঁজ করা চিঠির একটি দিক মাত্র ভিজিয়াছে ; যে দিকটা তাহার দেহের দিকে, বুকের দিকে ছিল—

আকস্মিক উত্তেজনায় মালতীর বুক- ধক্‌-ধক্‌ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখিতে পাইল। অফিসের টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া ললিত এক মনে কাজ করিয়া যাইতেছে, বুক পকেটে চিঠিখানা গোঁজা, তাহা খেয়ালও নাই। তাহার কপাল, গলা সব ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জামাটাও—আর তাহারই সংস্পর্শে চিঠিখানি উঠিতেছে সেঁতাইয়া !···

কথাটা মনে হইতেই ললিতের চেহারাটা তাহার চোখের সামনে পরিষ্কার ভাসিয়া উঠিল। সুন্দর চেহারা তাহার, ঘামিলে আরও সুন্দর দেখায়। বিবাহের পর সামান্য যে কয়দিন সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছে।···অমন সুন্দর দেহ অনিয়মে অযত্নে হয়ত মলিন হইয়া যাইতেছে। কে-ই বা সেখানে তাহাকে দেখিবে, কে বা যত্ন করিবে !

ললিতকে কাছে পাইবার জন্য তাহার মনটা আকুলিবিকুলি করিয়া উঠিল। উড়িয়া যাইবার উপায় থাকিলে সেই মুহূর্ত্তে সে উড়িয়া যাইত। ···নানা অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মাথাতে আসিতে লাগিল। আচ্ছা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে যদি একা চুপি চুপি ট্রেনে চাপিয়া পাটনা

চলিয়া যায়, তাহা হইলে কেমন হয়? হঠাৎ ললিতের অফিসে বা বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলে সে কী পরিমাণই না বিস্মিত হইবে!···কল্পনায় ললিতের বিস্মিত দৃষ্টি অনুমান করিয়া সে আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু না, তাহা সম্ভব নয়। বাবা-মা ভাবিবেন, এখানে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইবে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার!···তাহার পর আর বাপের বাড়িতে মুখ দেখানো যাইবে না। ললিতও হয়ত তিরস্কার করিবে!··· মালতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সে কল্পনাকে বিদায় দিল।

সহসা তাহার নজর পড়িল চিঠিখানার উপর। ললিত কাছে নাই সত্য; কিন্তু তাহার পরশ তো আছে। তাহারই চিঠি—ললিতেরই হাতের লেখা এবং বুকের স্পর্শ আসিয়াছে নীলরঙের এই খামখানায় ভরিয়া। তাহার দেহের স্বেদবিন্দুর স্মৃতি এখনও ঐ কাগজটাতে লাগিয়া আছে।

সে চিঠিখানা নাকের কাছে তুলিয়া ধরিল। বোধ হয় ভাবিয়াছিল ললিতের দেহের সৌরভও কিছু আছে উহাতে, কিন্তু কাগজ-কালির একটা অতি পরিচিত গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইল না। তা না পাক্—তবু ললিতেরই স্পর্শ আছে উহার মধ্যে। মালতী চিঠিখানাকে সজোরে গালের উপর চাপিযা ধরিল, তাহার পর বুকে, কপালে। অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া দিল চিঠিখানা। এখানি প্রতিদিনের সাধারণ চিঠি নয়—বিশেষ চিঠি এটি। এটি শুধু বাণীই আনে নাই, পরশও আনিয়াছে তাহার স্বামীর!

মালতীর চিঠি থাকিত তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে, সমস্ত কাপড়-জামার তলায়। কিন্তু এখানা সে সেখানে রাখিল না, এটা সে কাছে কাছেই রাখিয়া দিল। কখনো থাকিত ব্লাউজের মধ্যে, কখনো বা বালিশের নীচে। চিঠিখানা সে আর একবারও পড়ে নাই, কিন্তু তবু সে উহাকে ছাড়িতে পারে না। যখনই ললিতের কথা মনে হয়, তাহার চিঠিখানা বাহির করিয়া

মুখে-বুকে চাপিয়া ধরে। তাহার মনে হয় উহারই মধ্য দিয়া সে ললিতের স্পর্শ পাইতেছে। স্বপ্ন দেখে সে, চিঠিখানা বুকে করিয়া ললিত অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহার ললাটে কণ্ঠে স্বেদবিন্দু—

এম্‌নি করিয়া হপ্তা-দুই কাটিবার পর হঠাৎ একদিন ললিত আসিয়া উপস্থিত হইল, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। অফিসেরই কি একটা কাজে সে আসিয়াছে, একটি রাত্রি থাকিয়া কালই আবার চলিয়া যাইতে হইবে। তা হোক্—এই ক্ষণিক মিলনের মূল্যই কি কম! মালতী আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল, যত রকমের প্রসাধন, যত রকমের বাক্যবিন্যাস মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কোনটাই মনে পড়িল না। সুখে, লজ্জায়, অকারণ হাসিতে রঞ্জিত হইয়া কোনমতে সে ভাইবোনদের সহিত হাস্য-পরিহাসে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিল, তাহার পর এক সময়ে দুরু দুরু বক্ষে স্বামীর কাছে উপস্থিত হইল।

তাহার পরের ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত এবং অতি সাধারণ। হাসিতে, খুশীতে, গল্পে কোথা দিয়া যে রাত গভীর হইয়া গেল, তাহা বোঝা গেল না। ললিত বাসা ঠিক করিয়াছে পাটনাতে, কদমকুঁয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট-মতো বাসা বাড়ি। মালতীর শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত আছে—শুধু আষাঢ় মাস মালতীর জন্মমাস বলিয়া মা আপত্তি করিয়াছেন, শ্রাবণ মাস পড়িলেই চার-পাঁচদিনের ছুটি লইয়া ললিত আসিবে, এখান হইতে দেশে গিয়া দুইদিন থাকিয়া সোজা পাটনায় যাইবে তাহারা। সেখানে বামুন-চাকর পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া আছে—ললিত শুনাইয়া দিল।

মালতী কহিল, ঠাকুর আবার কি হবে, আমি রাঁধব।

ললিত জবাব দিল, হ্যাঁ, তাই না!…তারপর ভাত রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলো, আর আমি অফিস কামাই ক'রে ডাক্তারবাড়ি ছুটোছুটি করি!…তার চেয়ে একটা বাবাজীর মাইনে গোনা ঢের সহজ!

মালতী মুখে আঁচল দিয়া কহিল, বামুনঠাকুর আবার বাবাজী! তুমি যেন কি, সে কি তোমার জামাই?

ললিত কহিল, হ্যাঁ, একবার ঠাকুর ব'লে দেখো না—লাঠি নিয়ে তাড়া করবে! ওখানে ঠাকুর বলে নাপিতদের, বামুনঠাকুর হ'লো বাবাজী!......

এমনি সব টুক্‌রো টুক্‌রো কথা। ছোট ছোট পরিহাস। অকারণে হাসি।

সহসা এক সময়ে মাথার বালিশটা নিবিড় করিয়া টানিতে গিয়া ললিতের হাতে একটা কাগজ ঠেকিল। সে কহিল, ভাল কথা, শুতে এসে দেখি, মাথার বালিশের নীচে আমারই একখানা পুরোনো চিঠি। এসব চিঠি যেখানে সেখানে ফেলে রাখো কেন, তুলে রাখতে পারো না? কেউ যদি দেখতে পায়, কি কেলেঙ্কারী হবে বলো দেখি—! ছিঁড়ে ফেল্‌লেও তো পারো।

মালতী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ললিতেরই বালিশের খাঁজে মুখ লুকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, না, না, সব চিঠিই আমি পড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্সয় পুরে ফেলি। এটা—

এটা কি?

এটা আমি কাছে-কাছেই রাখি কি না—ও প্রায় আমার বুকের মধ্যেই থাকে।

দারুণ বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, কেন বলো দেখি?

মালতী জবাব দিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

ললিত জোর করিয়া তাহার মুখের উপর হইতে হাত দুটা সরাইয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, তাহার পর চুপি চুপি কহিল, ব্যাপার কি বলো তো?

মালতী তখন জবাব দিল, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?

কৈ না! চিঠি পড়ে তো আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বরং ওখানাই বোধ হয় সব চেয়ে ছোট চিঠি, কিছুই তো নেই ওতে—

তবু মালতী বলিতে পারে না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে ললিতের বুকের মধ্যেই মুখ রাখিয়া থামিয়া থামিয়া আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ললিত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার হাসি আর থামিতেই চায় না। অনেকক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিল, তুমি মাসিকপত্রে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করো মালতী, তোমার খুব পসার হবে—

মালতী তাহার হাসিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সে চুপ করিয়া রহিল। ললিত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, রাগ করলে মধুমালতী?······ঘটেছিল যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, তাই হেসে উঠেছিলুম: কিন্তু তোমার কল্পনার জোর আছে সত্যি!

মালতী রাগ করিয়া কহিল, হোক্ অন্যরকম। আমি শুনতে চাইনে।

কিন্তু ললিত আসল কথাটা খুলিয়াই বলিল, চিঠিটা লিখে খামে মুড়ে টেবিলেই রেখে দিয়েছিলুম। তারপর ভোর বেলা চাকর লাল্লু চা ঢেলে দিতে এসে দিব্যি ক'রে টেবিলের ওপর খানিক চা ফেলে গিয়েছিল, অতটা লক্ষ্য করি নি। ব্যাস্—বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে একটা বই টেনে নিতে গিয়ে একেবারে চিঠিখানা সেই চায়ের ওপর!···তখন আর চিঠি লেখবার সময়ও ছিল না, আর দেখলুম খামখানাই বেশী ভিজেছে, ভেতরের চিঠিখানা বেশ পড়া যায়, তাই খামটা পাল্‌টে চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিলুম। এই হ'ল তোমার চিঠির ইতিহাস!

মালতীর সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনার উপর কে যেন খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। এমন কি স্বয়ং ললিতের উপস্থিতি, এই প্রণয়লীলা—ইহাও যেন সেই মুহূর্ত্তের মত সম্পূর্ণ ব্যর্থ, অর্থহীন হইয়া গেল। সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

ললিত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া কহিল, রাগ করলে, হ্যাঁ গো?

মালতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না।

কিন্তু আর কোন কথা কহিল না। ললিত হাসিয়া কহিল, তুমি নিতান্তই ছেলে মানুষ মালতীমঞ্জরী, ছি ছি, একটা সামান্য চিঠির জন্যে তুমি আমার ওপর অভিমান করলে, সে-ও আমারই চিঠি! সত্যি কথা বলার জন্য আমার এই শাস্তি?

সত্যই তো! মালতীও হাসিয়া ফেলিল। তাহার স্বামীর চেয়ে তাঁহার চিঠি বড় হইয়া উঠিল! শুধু তাহার কল্পনার সহিত আসল সত্যটা মেলে নাই বলিয়া এ তাহার কী অহেতুক রাগ!

সে চুপি চুপি বলিল, ছাই চিঠি। বালিশের তলায় হাত ঢুকাইয়া চিঠিখানা ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সজোরে ললিতের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কিন্তু তুমি সত্যি কথাটা না বললেই ভাল হ'ত বোধ হয়।

পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া মালতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছিল, চিঠিটার কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু স্নান শেষ করিয়া ললিতের জন্য চা লইয়া ঘরে ঢুকিতে দিনের আলোতে তাহার প্রথমেই নজরে পড়িল সেই চিঠিখানা, তাল পাকাইয়া জানালার কাছে পড়িয়া আছে।

ললিত তখনও ঘুমাইতেছিল। মালতী টেবিলের উপর কাপটা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইল। ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত, এখনই চাকর ঘর ঝাঁট দিতে আসিবে, সে যদি পড়িয়া ফেলে!

কিন্তু চিঠিটা ছিঁড়িতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল সে। তাহার যেন মনে হইল সারা বুকটা কে মুচ্ড়াইয়া ধরিতেছে, চিঠিখানার সহিত যেন প্রাণটাও তাহার বাহির হইয়া যাইবে। এই বিশেষ চিঠিটিকে কেন্দ্র করিয়া এই দশ-বারো দিন যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছে, তাহার নিজের কাছে সে স্বপ্নের মূল্য তো কম নয়। হোক না তাহার মূল্যের ইতিহাসটা মিথ্যা, তবু এ চিঠি তাহার

কাছে সত্য-সত্যই তাহার স্বামীর পরশ বহন করিয়া আনিয়াছিল। আজ সত্যকার ইতিহাসটা জানা গেল বলিয়া কি সেদিনের সমস্ত অনুভূতি' ব্যর্থ হইয়া যাইবে ?···না, এ চিঠি মালতী ছিঁড়িতে পারিবে না। কিছুতেই না।

সে চিঠিখানা সযত্নে আবার সোজা করিয়া ব্লাউজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল, তাহার পর ললিতের গা ঠেলিয়া ডাকিল, ওগো শুনছ, ওঠো। তোমার চা এনেছি—

আত্মহত্যা

শকুন্তলা প্রদীপটি জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা সন্ধ্যা আসিয়া সংবাদ দিল, দিদি অমলদা আসছে !

মুহূর্ত্তের জন্য শকুন্তলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াই একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, সে কি রে ?…ধ্যেৎ !

—হ্যাঁ গো দিদি, সত্যি। ঐ গলির মোড় পেরোচ্ছে দেখে এলুম, তুমি জান্‌লা দিয়ে দেখো না, এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—

কিন্তু জান্‌লা দিয়া আর দেখিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক শকুন্তলার কানে আসিয়া পৌঁছিল, আরে এরা সব গেল কোথায়—ও সন্ধ্যা, বাড়ী ছেড়ে ভাগ্‌ল নাকি ?

শকুন্তলা অকস্মাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একবার নিজের পরণের কাপড়টার দিকে আর একবার আসবাবগুলার দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া চাপা-আকুল কণ্ঠে কহিল, সন্ধ্যা, লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে একটু ছাদে বসা, হঠাৎ যেন ঘরে আনিস নি—যা ভাই !

এবং পরক্ষণেই প্রায় ছুটিয়া আর একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনই নীচে নামিতে পারিল না, দিদির এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকটা মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। অমল তাহার বড়দিদির দেবর এবং এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয় অতিথি। বিশেষ করিয়া, সন্ধ্যা তাহার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী তরুণটিকে দেখিলে তাহার মেজদি একটু বেশীই খুশী হয়। তাহার জ্ঞান অবশ্য বেশী দিন হয়ও নাই—বছর দুই-তিন হইবে—কিন্তু তখন ছিল অমল কিশোর মাত্র, এখন সে

যৌবনে পা দিয়াছে, যদিও তাহার মুখের মধ্য হইতে কৈশোরের কমনীয়তা এখনও বিদায় লয় নাই, দেখিলে কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হয় মনে মনে। সন্ধ্যাও 'অমলদা'কে ভালবাসিত ; সুতরাং সে অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া খুশী মনেই দিদিকে সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল—হঠাৎ দিদির এই অদ্ভুত আচরণে অত্যন্ত দমিয়া গেল—কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত-ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণে অমল উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আন্দাজে আন্দাজে ছাদটা পার হইয়া একেবারে দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, এ কী রে, এখানে এমন চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভূত দেখেছিস নাকি? মাউইমা কৈ? আর তোর মেজ্‌দি—?

সন্ধ্যা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, মা গা ধুতে গেছেন আর মেজদি সন্ধ্যে দিচ্ছে—আ—আপনি বসুন না অমলদা। চলুন, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি ছাদে—

—ইস! ভারী যে খাতির করতে শিখেছিস্ দেখছি। যা যা, আব মাদুর পাত্‌তে হবে না, আমি এখানেই বসছি।

সন্ধ্যা কোন প্রকার বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে সেই প্রকাণ্ড ভাঙ্গা তক্তাপোষটায় অতিশয় মলিন শয্যার উপরেই বসিয়া পড়িল। কহিল, আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখন তোমার মেজদিকে সংবাদ দাও, তিনি দয়া ক'রে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান্। তাঁকে বলো যে এ ঘরটাও তাঁর সন্ধ্যে দেওয়ার এলাকার মধ্যে পড়ে—

কিন্তু ইহার পূর্ব্বের একটা ইতিহাস আছে ; প্রায় সব গল্পেরই থাকে।

শকুন্তলার বাবা হরিপ্রসাদবাবুরা চার ভাই, তাহার মধ্যে হরিপ্রসাদ এবং তাঁহার মেজো ভাই জ্যোতিপ্রসাদ উপার্জ্জন করিতেন, আর দু-ভাই দেশের বাড়িতেই বসিয়া খাইতেন। জমিজমা যাহা কিছু ছিল তাহাতে

ভাতটা হইত, বাকী হরিপ্রসাদ জ্যোতিপ্রসাদের অনুগ্রহে চলিত। হরিপ্রসাদ কাজ করিতেন ভালই, প্রায় শ'খানেক টাকা মাহিনা পাইতেন। কিন্তু মানুষটি খুব সৌখীন ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় প্রায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাসা ভাড়া দিয়া, এখানে মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাঠাইয়া, ভাল মাছ এবং ল্যাংড়া আম খাইয়া, ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড়-জামা পরাইয়া ও স্কুলের খরচ জোগাইয়া বরং প্রতি মাসে তাঁহার কিছু ঋণই হইত। বলা বাহুল্য যে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে যে ঋণ তিনি করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শোধ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল, হয়ত বা সেই উন্নতির পথ চাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহারই মধ্যে যে জীবনের অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

কিন্তু কার্য্যত তাহাই ঘটিল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন তিনি মারা গেলেন তখন শ্মশান-খরচার জন্যই অলঙ্কার বাঁধা দিতে হইল। অফিসে যে ঋণ ছিল তাহাতেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা শেষ হইয়া গেল। গৃহিণীর সামান্য অলঙ্কার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহেই গিয়াছিল, কন্যাদের কাহারও ও বস্তু ছিলই না—সুতরাং ঘটি-বাটি বেচিয়াই, বলিতে গেলে, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ভদ্রমহিলা দুই কন্যা ও এক শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া দেশের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিপ্রসাদের ভাইয়েরা অকৃতজ্ঞ নন্, তাঁহারা যথাসাধ্য যত্নের সহিতই ইহাদের গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য আর কতটুকু? জ্যোতি-প্রসাদ ভাইদের যা সাহায্য করিতেন, তাহার উপর আর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন, তাহার বেশী আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাতে চারিটি প্রাণীর ভরণপোষণ চলে না। শকুন্তলা সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছিল তাহার আর সন্ধ্যার পড়াশুনা তো বন্ধ হইলই, তাহাদের ছোট ভাই অভয়েরও লেখাপড়া শিখিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। শুধু উদরান্নের জন্যই

শকুন্তলা ও তাহার মায়ের অনেকগুলি ভাল ভাল শাড়ী আবার দোকানে চলিয়া গেল। শকুন্তলার ভগ্নিপতির অবস্থাও এমন কিছু সচ্ছল নয়, আর সেখানে হাত পাতাও তাঁহাদের আত্মসম্মানে বাধে।

এ আজ প্রায় মাস দুয়েকের কথা। ইহার মধ্যে জামাতা বিমল বার দুই ইহাদের খবর লইতে আসিলেও অমল আসিতে পারে নাই। তাহার পরীক্ষা ছিল সামনে, সেইজন্য সে কলিকাতাতেই থাকিত, দেশে আসিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। কলিকাতায় থাকিতে সে প্রায় নিয়মিতভাবেই ইহাদের বাড়ীতে আসিত, শকুন্তলার সহিত তাহার একটা বেশ সখ্যের সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার পড়াশুনার আগ্রহ ছিল খুব বেশী, অমলের দ্বারা সেদিকে অনেকটা সাহায্য হইত, অমলেরও এই প্রিয়ভাষিণী বুদ্ধিমতী মেয়েটির সাহচর্য্য ভালই লাগিত—যদিচ রূপগৌরব শকুন্তলার বিশেষ ছিল না।

এ-হেন অমলকে আজ এতদিন পরে আসিতে দেখিয়া শকুন্তলা বিব্রত হইয়া পড়িল তাহার কারণও ঐ দারিদ্র্য। অমল ছেলেটি সৌখীন, যেমন আর পাঁচজন কলেজের ছেলে হইয়া থাকে—সিল্কের পাঞ্জাবী-স্নো-পাউডার-হাতঘড়ির একটা পুতুল! বিশেষ করিয়া ইদানীং যখন সে শকুন্তলাদের বাড়িতে আসিত তখন তাহার প্রসাধনের পারিপাট্য আর একটু বৃদ্ধি পাইত। সেই অমলকে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কল্পনা করিয়া শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। শুধু কি তাই, তাহার নিজের পরণে যে কাপড়টা আছে সেটাও বোধ হয় পনেরো দিন সাবানের মুখ দেখে নাই—পয়সার অভাবে সোডা-সাজিমাটিও আনানো যায় নাই।

সে এপাশের ঘরে আসিয়া ব্যাকুলভাবে আলনার দিকে চাহিল। না, ভদ্র কাপড় একখানাও নাই। হয়ত এখনও বাক্সটা খুঁজিলে একখানা ফরসা কাপড় বাহির হইতে পারে কিন্তু তাহার চাবিও মায়ের কাছে, তাছাড়া মাকে কৈফিয়ৎই বা কি দিবে? মা যদি হঠাৎ বলিয়া বসেন যে,

'অমল ঘরের ছেলে, ওকে দেখে ফরসা কাপড় পরবার কি দরকার হ'লো ?' তখন·কি বলিবে সে ?···

অকস্মাৎ শকুন্তলার আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল। এপাশে একটা ঈষৎ-জীর্ণ নীলাম্বরী শাড়ী আনলার উপর কোঁচানো আছে বটে কিন্তু সেটাও কয়দিন ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখার ফলে তেলে-ময়লায় দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে—অথচ যেটা সে পরিয়া আছে সেটা এতই ময়লা যে কোনমতে ঘরেব লোকের কাছেও পরিয়া থাকা যায় না। নীলাম্বরীতে দুর্গন্ধ হইলেও ময়লা বোঝা যায় না, এই একটা সুবিধা—

পাশের ঘর হইতে আবার অমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্যাপার কি ? তোমার মেজদি আর নরলোকের মুখদর্শন করবেন না নাকি ? হলা সহি শউন্তলে, দীনজনকে দয়া করো—এ ঘরেও একটা আলো দাও !

শকুন্তলার কানের কাছটা অকারণেই গরম হইয়া উঠিল। শকুন্তলা নামটা লইয়া অমল যতদিন, যতবারই ঠাট্টা করিয়াছে, ততবারই শকুন্তলা এমনি একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে—এবং কে জানে কেন, ততবারই তাহার মনে হইযাছে যে অমল নিজেকে দুষ্মন্ত বলিয়া পরিহাসটা সম্পূর্ণ করিতে চায় কিন্তু পারে না, লজ্জায় বাধে—

সে প্রায় মরিয়া হইয়াই নীলাম্বরীটা টানিয়া লইল। কিন্তু না, এ বড়ই দুর্গন্ধ, বহু দূর হইতেও পাওযা যাইবে !···অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা আরক্তমুখে লণ্ঠনটা লইয়া সেই অবস্থাতেই এ ঘরে পা দিল।

—আরে, আসুন, আসুন, দেবী শকুন্তলে ! তবু ভাল যে অভাজনদের মনে পড়ল—

কিন্তু এই চাপল্য এবং অমলেব পারিপাট্যযুক্ত প্রসাধন এই আবহাওয়ার মধ্যে এতই বেমানান্ ঠেকিল, অন্তত শকুন্তলার কাছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন চাবুকের মত তাহাকে আঘাত করিল। জরাজীর্ণ

প্রকাণ্ড ঘর, বোধ হয় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাতে চূণের কাজ পর্য্যন্ত হয় নাই—জানলা দরজার অর্দ্ধেক নাই—আর তাহার মধ্যে পায়াভাঙ্গা খিরাট এক তক্তাপোষ কোনমতে সাজানো ইটের উপর দেহরক্ষা করিয়া ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া আছে। তাহার উপর কয়েকটি কাঁথা ও তোষকের অতিশয় মলিন একটা শয্যা এবং তাহারও উপরে অসংখ্য ছারপোকার দাগে কলঙ্কিত একটা শত-ছিন্ন মশারী খানিকটা ঝুলিয়া আছে। ঘরের মেঝে খানিকটা সিমেণ্ট ও খানিকটা খোয়াতে বিচিত্রিত। এ পাশে একটা ভাঙ্গা র‍্যাকে শকুন্তলার পিতামহের আমলের খানকতক পুঁথি ও বই কীটদষ্ট ও ধূলিমলিন অবস্থায় স্তূপাকার করা, ওধারে বিভিন্ন তাকে কতকগুলা ডেয়ো-ঢাক্‌না, ভাঙ্গা ফুটা জিনিষের বিচিত্র সমাবেশ। সমস্তটা জড়াইয়া এমনই শ্রীহীন এবং লজ্জাকর যে নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া লজ্জায় অপমানে শকুন্তলার মুখটা প্রথমে আরক্ত পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুতেই মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিবার সময়েই একবার শুধু সিল্কের পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম এবং রূপালী ঘড়ির একটা মিলিত দীপ্তি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চোখের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল কিন্তু মানুষটার দিকে সে চাহিতে পারে নাই। সে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কোনমতে ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, অমলদা ভাল আছেন? বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি—

তাহার পরক্ষণেই, অমল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অমল অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এই মেয়েটি বিশেষ করিয়া তাহার আগমনে খুশী হয়, খুশী কেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, ইহাই সে জানিত, কিন্তু আজ এ কী হইল? সে যতটা সম্ভব পুরাতন দিনের কথা ভাবিয়া দেখিল, কৈ শকুন্তলার রাগ করিবার মত তো কোন ঘটনা ঘটে নাই।······সে তাহার দাদার মুখে ইহাদের অবস্থার কথা সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের এই শোচনীয় রূপ তাহাকে আঘাত করিলেও বিস্মিত

করিতে পারে নাই, কাজেই এইটাই যে শকুন্তলার ভাবান্তরের কারণ হইতে পারে, তাহা তাহার একবারও মনে হইল না।

শকুন্তলা নীচে নামিয়া আসিয়া কুয়াতলাতে গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, মা, অমলদা এসেছেন।

—কে এসেছেন? অমল? ও—আমাদের অমল! একজামিন দিয়ে দেশে এসেছে বুঝি!···বসাগে যা তুই, আমার হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি—। কতদিন দেখিনি ছেলেটাকে!

শকুন্তলা তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের আর একটা দরকারী কথা মনে পড়িল কহিলেন, ঘরে তো বিশেষ কিছু নেই। ছাখ্ দিকি, কৌটোটায় চারটি স্থজি পড়ে আছে কিনা, তাহ'লে উনুনটা ধরিয়ে একটু স্থজি ক'রে দে, আর এক পেয়ালা চা—। ভাগ্যিস্ খোকার দুধটা সাবুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলিনি—

অকস্মাৎ শকুন্তলার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা? ঐ ঘি-হীন স্থজি, আর ঐ জঘন্য চা—ও আর খাওয়াবার চেষ্টা ক'রো না! ওসব হাঙ্গামা ক'রে কাজ নেই।

মা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, পাগল আমি হয়েছি, না তুই হয়েছিস? অমল আমার পেটের ছেলের মত, ওর কাছে আবার লজ্জা কি? আর ও না জানেই বা কি? ···ওর কাছে আমার ঢাকবার তো দরকার নেই কিছু।···মেয়ের যত বয়স বাড়ছে তত যেন গ্যাকা হচ্ছেন। যাও, যা বলছি তাই করো গে—

মায়ের মেজাজ শকুন্তলা জানিত, প্রতিবাদ তিনি একদম সহিতে পারেন না। অগত্যা রান্নাঘরে গিয়া উনানে আঁচ দিবার চেষ্টা করিতে হইল; কিন্তু তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া কোথাও চলিয়া যায় কিংবা কুয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মন, তাহার দেহ সব যেন কেমন

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কিছুরই বোধ ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল একটা দুর্নিবার লজ্জার—

সে উনানে আগুন দিয়া বাহিরে আসিল না, ধোঁয়ার মধ্যেই বসিয়া রহিল। অমল বি-এ পড়িতেছে, খুব সম্ভব পাশও করিবে, সে সুশ্রী, সচ্চরিত্র—সুতরাং তাহার বাবা যে বিবাহে রীতিমত অর্থ দাবী করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহের যে কোন সম্ভাবনা নাই তাহা শকুন্তলা নিজেই জানিত; শুধু রূপা নয়, অমলের বাবা ছোট ছেলের বিবাহে রূপও চান। সে কথা সে কখনও বোধ হয় ভাবেও নাই, আশা করা তো দূরের কথা। তবু, তবু আজ কে জানে কেন, তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকের অনেকখানি যেন কে দলিয়া পিষিয়া নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তীব্র একটা আশাভঙ্গের বেদনাতে তাহার চিত্ত যেন মূর্চ্ছাহত!

তবে কি, তবে কি মনের অজ্ঞাতসারে, মনেরই কোন্ সঙ্গোপনে সে আশার স্বপ্ন দেখিয়াছিল? কলিকাতায় যখন অমল নিয়মিত তাহাদের বাড়ি আসিত, সেই সব দিনের কথা মনে পড়িল। অমলের কাছে সে পড়া বলিয়া লইত, অমল সেই পাঠচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে চালাইত সাহিত্যচর্চ্চা! প্রকাশ্যে, সকলকার সামনেই চলিত তাহাদের গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! কৈ, কখনও তো প্রণয়ের আভাষমাত্র তাহাদের কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায় নাই। দুই-একবার সে অমলের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে, একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, আর একবার দক্ষিণেশ্বরে—কিন্তু তখনও তো কেহ রঙ্গীন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে নাই। অমল তাহাকে বলিত—বন্ধু, সেই বন্ধুত্বতেই তাহারা সুখী ছিল। তবে? সেদিন কোথাও, কোন কল্পনাতে কি তাহার রঙ্ ধরে নাই?…

অকস্মাৎ তাহার কর্ণকপোল উত্তপ্ত করিয়া বাবার অসুখের পূর্ব্বে শেষ নিভৃত দিনটির কথা তাহার মনে পড়িল। অনেক রাত্রে অমল বাড়ি ফিরিতেছিল, সে এক হাতে পান আর এক হাতে আলো লইয়া দরজা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বিদায়ের আগে পান দিতে গেলে অমল হাত পাতিযা লব নাই, নিজেব মুখের কাছে তাহার পান-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া ধরিয়াছিল! অগত্যা শকুন্তলা পানটা তাহার মুখে পুরিয়া দিতে যায, আব সেই সময দিয়াছিল অমল তাহার আঙ্গুল ছোট্ট একটি কামড়। সামান্য ঘটনা, ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়—ছেলেমানুষি অমল অহরহই করিত—তবু শকুন্তলা সেদিন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িল, ঐ শেষের দিকেই—আকস্মিক বজ্রপাতে তাহার সুখের বাসা পুড়িয়া যাইবার ঠিক আগেই, রসিকতার ছলে অমল দিয়াছিল তাহার বাহুমূলে সজোরে এক চিমটি। তখন সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, মায়েব কাছে নালিশ করিতেও ছাড়ে নাই—কিন্তু তবু, তাহার বেশ মনে আছে, সেই বেদনাটা তাহার যেন ভালই লাগিয়াছিল এবং সেই কালশিরার দাগটা মিলাইয়া যাইতে সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল—

সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল অমলেরই কণ্ঠস্বরে, কিন্তু এর আজ হ'লো কি?

পরক্ষণেই রান্নাঘরের দোরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—ও মা গো, এই একঘর ধোঁয়ার মধ্যে চুপটি ক'রে বসে আছে! পাগল্ নাকি? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা হাত ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। শকুন্তলা ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে এই আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গিয়া পড়িল অমলের ঘাড়ে। মুহূর্ত্তে মাত্র, তাহার পরই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া সোজা হইযা দাঁড়াইল কিন্তু তাহার দেহ-মনের এই আঘাতের

আকস্মিকতা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল, আমরা গরীব ব'লে কি আমাদের মান-ইজ্জতও থাকতে নেই মনে করেন?

এ কী হইল? অমল নিজেই ব্যাপারটার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য কথা, কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না! বিশেষত এমন ঘটনা আগেও বহু ঘটিয়াছে, শকুন্তলা রূঢ় অনুযোগ করিয়াছে, হয়ত বা একটা চড়-চাপড়ও দিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই উহাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু—

অমল আহতকণ্ঠে কহিল, ছি!···তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো! এমন করছ কেন?

বহুক্ষণের অপমান, লজ্জা ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, কিছু হয় নি আমার, আপনি যান, ঘরে গিয়ে বসুন গে। আমি যাচ্ছি—

সে আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উনান তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে,.জোর করিয়া সে কাজে মন দিল—

একটু পরেই মা আসিয়া বলিলেন, ওরে সন্ধ্যা, তোর অমলদাদাকে এই ছাদেই একটা মাদুর দেনা, এখানে বসুক—ঘরে যা গরম!···চা হ'লো শকুন্তলা?

অমল মৃদুকণ্ঠে জানাইল, চা থাক্ না মাউই-মা, আবার ওসব হ্যাঙ্গামা কেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, হ্যাঙ্গামার আর সামর্থ্য কোথায় বাবা, এখন শুধু একটু চা দেওয়া, তাই কষ্টকর! কিন্তু তাও যদি তোমাদের সামনে একটু না দিতে পারি তো বাঁচব কি ক'রে?

অমল আর কথা কহিল না। মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আর কত দেরি রে?

শকুন্তলা ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, তুমি একটু ক'রে দাও না মা, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগ্ছে—

মা উদ্বিগ্নভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি হ'লো আবার তোমার ? পারিনে বাবা ভাবতে—

শকুন্তলা কথার জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনা বাক্যে অমলকে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া গেল ! মা হালুয়া ও চা প্রস্তুত করিতে করিতে অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অমল কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে কী ইহারই জন্য দীর্ঘ ছয়মাস দিন গণিয়াছে ! শকুন্তলা যে তাহার মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের আগে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা দেশে চলিয়া আসিবার পর কলিকাতার আকাশ বাতাস যখন বিবর্ণ- বিস্বাদ ঠেকিল তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর দেশে ফিরিবার কোন অজুহাতই ছিল না বলিয়া কোনমতে তাহাকে এই দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে। সবার গোপনে নির্জ্জনে বসিয়া সে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার কবে প্রথম এই মধুরভাষিণী মেয়েটির দেখা পাইবে ! অথচ—

সে অনেক ভাবিয়াও নিজের কোন অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। মনে পড়ে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিনটিতে সে স্টেশন পর্য্যন্ত উহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াও শকুন্তলা কত গল্প করিয়াছে, যায় সাহিত্যচর্চ্চা পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। শরৎবাবুর কী একখানা উপন্যাস দেশে ফিরিবার সময় অমলকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিল— অমল সেকথা ভোলে নাই, বই কিনিয়াই আনিয়াছে। বিদায়ের পূর্ব্বে অমলই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য করিয়া নানা হাস্য-পরিহাসে শেষ মুহূর্ত্তগুলিকে উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও তো কোন অসঙ্গতি, কোন ছন্দপতন হয় নাই ! তবে ?

শকুন্তলার কাকীমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া অমলের পাশে বসিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ঘিরিয়া ধরিল। এই ছেলেটি এ বাড়ীর সকলেরই প্রিয়—অনেকদিন পরে তাহাকে পাইয়া তাঁহারা কলরব করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অমলের তখন এ সব অসহ্য বোধ হইতেছে, সে যেন পলাইতে পারিলে বাঁচে! কোথাও নির্জ্জনে বসিয়া তাহার একটু নিশ্বাস ফেলা দরকার—

চা ও খাবার শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল, তাহার তখন খাইবার মত অবস্থা নয়, তবু পাছে সন্ধ্যার মা ক্ষুণ্ণ হন, তাই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এরই মধ্যে চললে বাবা?

—হ্যাঁ মাউই-মা, আবার কাল আসব। আজই এসেছি, গরমে ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। সকাল ক'রে শুয়ে পড়ব।

কিন্তু তবুও অমল তখনই যাইতে পারিল না, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, শকুন্তলাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, তার জন্যে এই বইটা এনেছিলুম—

কী জানি বাবা, তার আজ কি হ'লো!…ওরে সন্ধ্যা, এই বইটা তুলে রাখ্‌ত—মেজদির বই।—আর বই! এখানে এসে ও পাট তো নেই-ই একেবারে। এখন কি ক'রে যে জাতধর্ম্ম বাঁচবে তাই শুধু ভাবছি বাবা, একটা দোজ-বরে তেজ-বরে পেলেও বেঁচে যাই—

কথাটা সজোরে অমলকে আঘাত করিল। এ-ব্যাপারটা সে ভাবেই নাই। সত্যই তো, শকুন্তলার বিবাহের বয়স তো অনেকদিনই আসিয়াছে—

সে 'তাহ'লে আসি' বলিয়া নীচের দিকে পা বাড়াইল। আশা ছিল বিদায়ের পূর্ব্বে অন্তত শকুন্তলার দেখা মিলিবে, কিন্তু কোথাও তাহার কোন সম্ভাবনা রহিল না।

ওরে তোর অমলদাকে আলোটা দেখালি না?—মা কহিলেন। না আলোর দরকার নেই, আলো রয়েছে—

অমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। নীচের তলাটা যেমন্ অন্ধকার তেম্নি ভাঙ্গা ও স্যাঁৎসেতে। এখানে প্রায় কেহই থাকে না, শুধু কাঠ-কুটা আবর্জ্জনা রাখা হয়। সেখানে সে কাহাকেও দেখিবার আশা করে নাই, কিন্তু একেবারে সদরের কাছে গলিপথটায় গিয়া দেখিল একটি কেরোসিনের ডিবা পাশে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে শকুন্তলা, দৃষ্টি তাহার কম্পমান দীপ-শিখার উপর নিবদ্ধ।

অমল কাছে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল আরও কাছে আসিয়া তাহার স্বেদসিক্ত হাত দুইটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, কী হয়েছে কিছুতেই বলবে না কুন্তলা? কেন তুমি এমন বিরূপ হয়ে রইলে আমার ওপরে?

কুন্তলা! অমলের আদরের ডাক। অকস্মাৎ একটা প্রবল কান্না যেন শকুন্তলার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোক, তবু তাহাতেই অমলের চক্ষু দুইটি বড় করুণ, বড় অসহায় ঠেকিল। শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেই করুণ দৃষ্টির পিছনে যে সিল্কের পাঞ্জাবী ও সোনার বোতাম ঝল্‌মল করিতেছিল সেটাও চোখে পড়িতেই সে আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত উদাসকণ্ঠে কহিল, কিছুই হয়নি অমলদা। আমরা বড় গরীব, দিনরাত অভাবের সংসারে খাটতে হয়, তাই হয়ত সব সময়ে হাসিমুখ রাখতে পারি না। তাতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।

অমলের ওষ্ঠ দুইটি কিছুক্ষণ নীরবে কাঁপিবার পর স্বর বাহির হইল—বিনা অপরাধে কেন যে বারবার এমন আঘাত করছ শকুন্তলা, বুঝতে পারছি না। থাক্—তুমি শান্ত হও, তারপর একদিন আমার দুষ্কৃতির কথা শুন্‌ব—

কিন্তু তবু সে চলিয়া যাইতে পারিল না। শুধু শকুন্তলা অহেতুক একটা ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাইল, কঠিনকণ্ঠে কহিল, আর, আপনি যখন তখন

আমার গায়ে অমন ক'রে হাত দেবেন না। আমরা বড় গরীব, মায়ের এক পয়সা পণ দেবার সামর্থ্য নেই তা তো জানেনেই। কেউ যদি ভিক্ষে দেবার মত ক'রে গ্রহণ করে তবেই তিনি কন্যাদায়ে মুক্ত হবেন। তার ওপর যদি কোন বদনাম ওঠে, তাহ'লে ভিক্ষাও কেউ দিতে চাইবে না, এটা আপনার বোঝা উচিত।

সেই শকুন্তলা! সংসারের কোন ক্লেদ যাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই। অমল আর দাঁড়ইতে পারিল না। শুধু কপাটটা খুলিবার পূর্ব্বে একবার স্খলিতকণ্ঠে সে কহিল—কিন্তু আমার দ্বারা যে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা নেই তাই বা কি ক'রে জানলে কুন্তলা? শুধু অনিষ্টই করতে পারি, উপকার কিছু করতে পারি না?

না, না, না—চাপা গলায় শকুন্তলা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল আপনি যান্—বাড়ী যান্। আমার কোন উপকার করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যান্।

অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ কপাটের ওপারে মিলাইয়া যাইতে হঠাৎ যেন শকুন্তলার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। সে চমকিত ব্যাকুলভাবে একবার বাহিরের দিকে চাহিল, সেখানে শুধুই অন্ধকার।···অমল সত্যই চলিয়া গিয়াছে।···

কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া শকুন্তলা অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া অমল শেষ যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সেইখানে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল আজ সারারাতের মধ্যে এ কান্না যেন থামিবে না।

উপরে তখন শকুন্তলার মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

শেষ